সপ্তম অধ্যায়

অন্নদাশঙ্করের প্রবন্ধ : আঙ্গিক ও শৈলী

অন্নদাশঙ্কর রায় সাহিত্যের কোন্ পথে বিচরণ করেননি, এটাই প্রশ্ন। তিনি গদ্য লেখক, গদ্য শিল্পী। তাঁর প্রথম জীবনের রচনার যে বাক্‌রীতি, অন্বয় এবং আঙ্গিক লক্ষ্য করা যায়, তা পরবর্তী জীবনের পরিণত বয়সের গদ্যেও সেই প্রবহমান অনুসৃতি ও বিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য তার ব্যক্তি জীবনের কথায় যদি আমরা আসি, তাহলে দেখা যায় যে, তাঁর জীবনের স্বপ্নই ছিল তিনি হবেন শক্তিশালী ও সুচতুর লেখক। তাঁর লেখা হবে চোখ ধাঁধিয়ে দেবার মতো উজ্জ্বল। কিন্তু ১৯৩৯-এ কটকে অবস্থানকালে পুত্র চিত্রকামের মৃত্যুই তাঁর জীবনে ও সাহিত্যে এক বিরাট মোড় ঘুড়িয়ে দিল। তখন থেকে প্রাবন্ধিকের ব্রত হল তাঁর লেখা হবে সহজ ও সরল, সপ্রেম ও সরস। যাতে থাকবে অমৃতের স্বাদ সৌন্দর্যের সারাৎসার। নতুন করে বরণ করে নেন সত্য ও সৌন্দর্যকে। যা না হলে আর্ট হয় না। বরণ করেন প্রেমকে, যা না হলে আর্ট হয় প্রেমহীন। অর্থাৎ ব্যক্তি জীবনের ট্র্যাজেডিও অনেক সময় একজন লেখকের লেখার ধরন পরিবর্তন করে দিতে পারে। কিন্তু শৈলী ও আঙ্গিক শুধু ব্যক্তি জীবনের ট্র্যাজেডির উপর নির্ভর করে না। একজন শিল্পীর শৈলী কিংবা আঙ্গিক যাই বলিনা কেন, তা নির্ভর করে একাধিক বিষয়ের উপর। জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতাই, লেখকের শৈলীর উৎসভূমি বললে মনে হয় ভুল হবে না। এমন অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা প্রাবন্ধিক অন্নদাশঙ্করের শৈলীর উৎস ভূমি। দেখা যাক্, তিনি কোথা থেকে পেলেন শৈলী সম্পর্কে ধারণা। অন্নদাশঙ্কর রায়ের শৈলীর উৎস সম্পর্কে জানতে হলে আমাদের প্রথমেই পড়া উচিৎ *প্রমথ চৌধুরী, সবুজপত্র ও আমি, আমার স্বধর্ম, আমার জীবন দর্শন* প্রবন্ধগুলি। কেননা এই প্রবন্ধগুলিতেই তিনি বার বার স্বীকার করেছেন তাঁর শৈলী ও আঙ্গিক সম্পর্কে।

অন্নদাশঙ্কর রায় সবুজপত্র সম্পর্কে বলেছেন যে— সবুজপত্র কেবল ভাষা নিয়ে লড়াই করেনি, করেছে ভাব নিয়ে। আসলে 'সবুজপত্র' চেয়েছিল পুরাতনের সংস্কার, সংস্কার মুক্তি। বাঙালীত্বের বুনিয়াদের উপরে গড়ে তুলতে চেয়েছিল নতুন ধরনের ইমারত। প্রমথ চৌধুরীর লিখন শৈলী অন্নদাশঙ্কর রায়কে আকর্ষণ করেছিল।

''সবুজ পত্রের যুগ কেবল 'সবুজপত্রেরই নয়, আরো পাঁচ-সাতখানা আদর্শবাদী মাসিকের। তাদের সকলের আদর্শ অবশ্য এক ছিল না, কতকটা পরস্পর বিরোধী কিন্তু বিরোধ যদি আন্তরিক হয়ে থাকে তবে তাতেও প্রগতির সাহায্য হয়। আমি তখন নগন্য বালকমাত্র। কিন্তু আমারও সাধ যেত বামন হয়ে চাঁদে হাত দিতে। 'সবুজপত্র' প্রবাসীতে, ভারতীতে লিখতে। বিশেষ করে সবুজপত্রে।

পরে আমার লেখা প্রবাসীতে। 'ভারতী'তে ছাপা হয়েছে। কিন্তু 'সবুজপত্রে' হয়নি, 'সবুজপত্র' আমার নজরে পড়েনি। 'সবুজপত্রে'র লেখক হবার সাধ আমার মেটেনি, তবু আমি সবুজপত্রে'রই একজন। আর কোনো পত্রিকার সঙ্গে আমার মনের মিল, প্রাণের মিল, দিলের মিল এতখানি হয়নি। এমনকি 'বিচিত্রা'র সঙ্গে, 'পরিচয়ে'র সঙ্গেও না। 'কল্লোলে'র সঙ্গে তো নয়ই। অথচ এদের সঙ্গেই আমার লেখক সম্পর্ক। এরাই আমাকে লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেয়। এদের গোষ্ঠীর সঙ্গে আমি একসূত্রে বাঁধা। বিচিত্রা'য় *পথে প্রবাসে* পড়ে প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের ভালো লাগে। সেই প্রথম আমার অস্তিত্ব তাঁর নজরে এল। তার আগে তিনি আমাকে চিনতেন না। তারও দু'বছর পরে প্রথম দেখা।"[১] তিনি আরো বলেছেন—

''পিছন ফিরে তাকাচ্ছি আর মনে হচ্ছে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য যেটা সেটা হচ্ছে স্টাইল। আমাকে আকর্ষণ করেছিল 'সবুজপত্রে'র লেখক বীরবলের তথা প্রমথ চৌধুরীর লিখন শৈলী। এরা যে দুই নন এক। এ তথ্য তখন আমার জানা ছিল না। তারপর সুরেশ চক্রবর্তীর স্টাইল। বলাবাহুল্য স্টাইল হচ্ছে মানুষটা। এঁরা আমাকে অলক্ষে সাহায্য করেছে। আমার নিজের স্টাইল তৈরী হয়েছে এঁদের সঙ্গে সংগত রেখে এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। যে রবীন্দ্রনাথ *পলাতকা*'র লেখক, *লিপিকা*'র লেখক। আরো কারো কারো নাম করা উচিত। তাঁদের সবাই কিন্তু 'সবুজপত্র' গোষ্ঠীর নন। স্টাইল বলতে আমি বুঝি প্রসাদগুণ। মাত্রাজ্ঞান। বাকসংক্ষেপ। লক্ষভেদ। মাধুর্য। কিন্তু ধ্বনির খাতিরে ধ্বনি নয়। বীরবলের, সুরেশ চক্রবর্তীর, এমন কি রবীন্দ্রনাথেরও এ বিষয়ে একটু দুর্বলতা ছিল। বাক্যকে সুভাষিত করতে গিয়ে অর্থ বিচ্যুতি বা অর্থান্তর ঘটত। শ্রুতিকে সন্তুষ্ঠ বা আকৃষ্ট করতে গিয়ে বুদ্ধিকে বঞ্চিত করা হতো। যথার্থতা বোধ হয় এঁদের কাছে মহামূল্য ছিল না। তার জন্যে আমাকে গান্ধীজীর কাছে পাঠ নিতে হয়েছে এবং বহু বিদেশী লেখকের কাছে উপরে যাকে লক্ষ্যভেদ বলেছি যথার্থতা বা প্রিসিসন না হলে তা অসম্ভব। কিন্তু কেবলমাত্র যথার্থতা থাকলেই যে লক্ষ্যভেদ হয় তাও নয়। সাহিত্য তো বিজ্ঞান নয়।"[২]

অন্নদাশঙ্কর রায় আর্ট সম্পর্কে ধারণা যে প্রমথ চৌধুরীর কাছ থেকে পেয়েছেন, তা 'প্রমথ চৌধুরী, সবুজপত্র ও আমি' প্রবন্ধে-স্বীকার করেছেন। প্রথম চৌধুরীর মতে— ''কবির নিজের মনের পরিপূর্ণতা হতেই সাহিত্যের উৎপত্তি।"[৩]

অন্যদিকে অন্নদাশঙ্কর রায় মনে করেন ''সাহিত্য হচ্ছে আত্মার লীলা। সৃষ্টি মাত্রেই তাই। নয়তো বিশ্ব সৃষ্টির সঙ্গে তার মিলবে কেন? মিলবে কী স্বত্বে?"[৪] প্রাবন্ধিক এমনও স্বীকার করেছেন— ''জীবনের সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে গিয়ে আর্টকেও আমি সরল, নিরাভরণ ও অকপট করি, ছলচাতুরী ছাড়ি, উজ্জ্বলতা পরিহার করি।"[৫] অন্নদাশঙ্কর একই সঙ্গে আঙ্গিক ও শৈলী সচেতন এবং রূপদক্ষ

শিল্পী। সাহিত্যিক ঐতিহ্যে শৈলীর কথা আসে সাহিত্য চেতনার কথার পরে। তিনি চিরকালই 'কেন লিখব' ও 'কী লিখব'র সঙ্গে 'কেমন করে লিখব'র কথা ভেবেছেন। এই শৈলীর পরিপ্রেক্ষিতেই তিনি একদিকে রসিকের রসপ্রাপ্তির সৌরভ বিতরণকারী, অন্যদিকে ইনটেলেকচুয়ালের কর্তব্য পালনকারী। তিনি দ্বৈত সত্তার 'ইনটেলেকচুয়াল ও আর্টিস্টের অধিকারী। তিনি এক হাতে রসের লেখা অন্য হাতে দায়িত্বের লেখা লেখেন। তাঁর মতে বলেছেন— ''আমার ডান হাত চিরকালের মতো পিত্তর ডিলাইটের জন্যে রাখা। কর্তব্যের জন্যে বামহাত।''[৬]

ধীমান দাশগুপ্তের মতে— ''অন্নদাশঙ্করের শৈলী সবুজপত্র যুগের সূত্র ধরে এসেছিল। 'সবুজপত্র' এ তখন চলছিল রবীন্দ্রনাথের 'ঘরেবাইরে' আর প্রমথ চৌধুরীর 'চারইয়ারী কথা', সে তাঁর শিক্ষানবিশীর কাল। একদিকে বাংলা সাহিত্যের রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রমথ; অন্যদিকে ওড়িয়া সাহিত্যের রাধানাথ, মধুসূদন, ফকির মোহন। ওড়িয়ায় নতুন পন্থী সবুজ সাহিত্যের তথা নতুন আদর্শের প্রবক্তা সবুজ দলের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্নদাশঙ্কর একজন।''[৭] তাঁর লেখনীর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল বাক্যের সরলতা ও স্নিগ্ধতা। অবশ্য সেটা সম্ভব হয়েছে— ছড়া-বাউলগানের সংসর্গের জন্যই।

এবারে শৈলী সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা নিয়ে যদি আমরা অন্নদাশঙ্করের শৈলীর দিকটি আলোচনা করি, বিষয়টি আরো পরিস্কারভাবে আমাদের সামনে ফুটে উঠবে।

মানুষের অনন্য সুলভ সম্পদ মন। মনের ত্রিবিধ বৃত্তি চিন্তা (Thinking), সংকল্প (Willing), অনুভব (Felling)। মনের এই ত্রিবিধ বৃত্তির প্রকাশ ঘটে তিনটি ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। জ্ঞানান্বেষণ, কর্মসাধনা ও সৌন্দর্য সৃষ্টি। আবার এই ত্রিবিধ সাধনায় তার যে প্রাপ্তি তাকে অন্য জনের কাছে পৌঁছে দিতে প্রয়োজন নানাবিধ প্রকাশ মাধ্যম। ভাষা তার অন্যতম। এই ভাষার সাথে শৈলীর একটা গভীর সম্পর্ক রয়েছে। শৈলী সবসময় বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। শৈলী সম্পর্কে অনেক সমালোচক অনেক কথা বলেছেন। যদি সোজা ভাষায় বলতে যাই তাহলে বলবো শৈলী হলো— প্রচলিত ব্যাকরণের বাইরের একটি দিক। কেননা, প্রচলিত ব্যাকরণ যেখানে শেষ হচ্ছে, শৈলী বিজ্ঞানের আলোচনা সেখান থেকেই শুরু হচ্ছে। তাহলে শৈলী কাকে বলব? এক কথায় বলতে গেলে শৈলী হল লেখকের সামগ্রিক ব্যক্তিত্বেরই প্রকাশ। আবার এর ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। সাহিত্য বিচারের দিক থেকে দেখলে রীতি শব্দটির সাথে আমরা সকলেই পরিচিত। শব্দটি প্রাচীন। তবে লেখকের আন্তরশায়ী চেতনা, আবেগ, কল্পনা ভাষায় প্রকাশিত হওয়ার জন্য বিশেষ ধরনের শব্দ প্রকল্প গ্রহণ করে। এক এক লেখকের এক এক ধরনের ভাষা প্রকাশ ভঙ্গিমা লক্ষ করা যায়। আবার এমন লক্ষ করা যায় যে একই লেখকের রচনা রীতির মধ্যেও নানা বৈচিত্র্য। সেটা আবার নির্ভর করে বিষয়ের বিভিন্নতার উপরে। মোটামুটি বেশ কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উপর একজন লেখকের

রচনা শৈলী গড়ে উঠে। যেমন লেখকের ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য, রচনার বিষয়, লেখক ও পাঠকের সম্পর্ক, লেখার উদ্দেশ্য ও প্রেরণা, রচনার সংরূপ এবং রচনার কালমাত্রার উপরও শৈলী নির্ভরশীল।

এবারে একটু বিস্তৃত আকারে বিষয়টি বোঝানো যেতে পারে। শৈলী বিজ্ঞান আধুনিক ভাষা বিজ্ঞানের একটি সমৃদ্ধ বিভাগ। ভাষায় যে যে বিভিন্ন উপকরণ ধ্বনি, শব্দ, বাক্য ইত্যাদি— তাদের বিন্যাস ও ক্রিয়া বিধিবদ্ধভাবে পালিত করার জন্যে প্রচলিত ব্যাকরণ কতগুলি নীতিগত প্রবণতা, বিশেষ বিশেষ সামাজিক পরিস্থিতি ও সাহিত্যিক প্রেরণার জন্যে ভাষা ব্যবহারকারী সব সময় সেই প্রচলিত গতানুগতিক রীতিনীতি মেনে চলেন না; যেমন—

''ওপারেতে কালো রঙ।
বৃষ্টি পড়ে ঝম্ ঝম্।।
এপারেতে লঙ্কা গাছটি রাঙা টুক্ টুক্ করে।
গুণবতী ভাই আমার মন কেমন করে।।''

এখানে লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় 'ভাই' শব্দটি সাধারণত পুংলিঙ্গ বাচক। তার বিশেষণটি স্ত্রী লিঙ্গবাচক হয়েছে গুণবতী। অর্থাৎ এখানে কবি ব্যাকরণের নিয়ম থেকে সরে এসেছেন। যদি ব্যাকরণের নিয়ম মেনে 'গুণবান্' শব্দটি সেখানে বসানো হতো তাহলে ছড়াটির বিশেষ রসই নষ্ট হয়ে যেত। অর্থাৎ প্রচলিত রীতিনীতি থেকে এই যে সরে আসা (Deviation) এটা যদি বিশেষ ভাব প্রকাশে প্রতিবন্ধক না হয়ে বরং অপরিহার্য হয়, বক্তার সামগ্রিক প্রকাশভঙ্গির সঙ্গে ও বিষয়বস্তুর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়, তাহলে আমরা ব্যাকরণের সেই নিয়ম লঙ্ঘনকে (deviation from norms) আর অশুদ্ধ প্রয়োগ বলতে পারি না, তখন তাকে ভাষা ব্যবহারে বৈচিত্র্য বলে স্বীকৃতি জানাই। অর্থাৎ 'অপরিহার্য ব্যতিক্রম' হল শৈলীর মূল পরিচয়। অর্থাৎ— ''প্রচলিত ব্যাকরণের এলাকা যেখানে শেষ হয়, শৈলী বিজ্ঞানের এলাকা সেখান থেকে শুরু হয়।''[৮]

এই যে ব্যতিক্রমী প্রকাশ ভঙ্গি তাকে কেউ কেউ শৈলীর (Style) আসল পরিচয় বলে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু এই বিশিষ্ট প্রকাশ ভঙ্গির অন্তরের মূল প্রেরণা হল লেখকের ব্যক্তিত্বের নিজস্বতা, যাকে সাহিত্যিক শৈলী বিশেষজ্ঞরা বলেছেন— Idisy necrasy। ''বস্তুত শৈলীর অন্তর্নিহিত মূল পরিচয়টি আমাদের চিরপরিচিত ফরাসী কথাটিতেই ধরা পড়েছে— Le style c'est I' homme me me (Style is the man himself) অর্থাৎ শৈলী হচ্ছে লেখকের সামগ্রিক ব্যক্তিত্বেরই প্রকাশ। লেখকের বা বক্তার মনন, চিন্তন, অনুভবের যে নিজস্ব রীতি তারই প্রকাশ হচ্ছে শৈলী।''[৯]

লেখকের এই ব্যক্তিত্বের মধ্যে সমাজ প্রচলিত ধারা থেকে স্বাতন্ত্র্যের প্রবণতা যদি না থাকে,

যদি তাঁর প্রকাশরীতিটি তাঁর গতানুগতিক ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি হয়, তবে তাতে ব্যতিক্রমী প্রকাশ ভঙ্গি না থাকতে পারে বা কম থাকতে পারে। সে ক্ষেত্রে ব্যাকরণের নিয়মানুগত ভাষা এবং প্রকাশ ভঙ্গিই তাঁর শৈলী। অর্থাৎ ব্যতিক্রমী প্রকাশভঙ্গিই সব ক্ষেত্রে শৈলীর পরিচয়চিহ্ন নয়। লেখকের ব্যক্তিত্বের মধ্যে যদি সে রকমের ব্যতিক্রমী প্রবণতা না থাকে তাহলে তাঁর শৈলীর মধ্যেও তা প্রকাশ পাবে না। সেক্ষেত্রে অবশ্য একটা কথা আমরা বলতে পারি যে মানুষের ব্যক্তিত্বই গতানুগতিক স্বাতন্ত্র্যহীন বা বৈশিষ্ট্য বর্জিত, সেই মানুষের ব্যক্তিত্বটি আমাদের যেমন আকর্ষণ করে না, তেমনি যে প্রকাশভঙ্গির মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য, কিছু নিজস্বতা নেই-তা আমাদের মুগ্ধ করে না। এ কারণেই স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত প্রকাশভঙ্গিকে শৈলীর প্রধান পরিচয় চিহ্ন বলা হয়। এই বিশিষ্ট স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত প্রকাশভঙ্গি অধিকাংশ সময়ই ব্যাকরণের গতানুগতিক ধারাকে লঙ্ঘন করে যায়।

সাধারণত শৈলীর বৈশিষ্ট্যই হল বিশেষ প্রকাশ ভঙ্গি। এই বিশেষকে বিশ্লেষণ করে তা থেকে 'সাধারণ' (general) সত্য আবিষ্কার করে বলেই শৈলী বিজ্ঞানকে বৈজ্ঞানিক বিধির মর্যাদা দেওয়া হয়। অর্থাৎ কোন কোন প্রেরণায় শৈলীর বিশেষ প্রকাশরূপটি গড়ে ওঠে, অর্থাৎ শৈলীর ক্ষেত্রে যে বৈচিত্র্য ও ব্যতিক্রম ঘটে তার মৌলকারণ কি, শৈলীর নিয়তৃশক্তি determining factor) কি, শৈলীতে যে বিশেষ প্রকাশ রূপটি পাই তার প্রকৃতি কি অর্থাৎ ধ্বনি, শব্দ, বাক্যগঠনের কোন্ বৈশিষ্ট্য ঐ প্রকাশরূপটি গড়ে তুলছে এবং কীভাবে গড়ে তুলেছে তার পরিমিতি ও পরিসংখ্যান কী, ইত্যাদি বিষয় শৈলীবিজ্ঞানে আলোচনা করা হয় এবং তার অন্তর্নিহিত সাধারণ সত্য আবিষ্কার করা হয়। এমনটাই মনে করেন ড. রামেশ্বর শ'।

অন্যদিকে ''ব্যক্তিভেদে বাক্যগঠন ও শব্দ প্রয়োগের ভিন্নতা যে শৈলী বিজ্ঞানের অন্যতম প্রেক্ষণীয় বিষয় সে কথা হকেট Hockett এবং চ্যাটম্যান Chatman-এর মতো শৈলী বিজ্ঞানীরা বলেছেন''[১০] অন্যদিকে ''বাংলা গদ্যের আলোচনা প্রসঙ্গে শৈলী বিজ্ঞানের প্রথম প্রয়োগ লক্ষ করা যায় শিশির কুমার দাশের Early Bengali Prose (1966) গ্রন্থে। তিনি এই গ্রন্থে শৈলী বিজ্ঞানের পদ্ধতি অনুসরনে উইলিয়ম কেরি থেকে বিদ্যাসাগর পর্যন্ত বাংলা গদ্য রীতির বৈশিষ্ট্য বিষয়ে মূল্যবান সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। উল্লিখিত পর্যায়ে, বাংলা গদ্যে সংস্কৃত, আরবি, ফরাসি ও দেশজ শব্দ ব্যবহারের তুলনামূলক চিত্র পরিস্ফুটনে তিনি পরিসংখ্যান (Statistics) এবং রেখাচিত্র (Graph) ব্যবহার করেছেন। ভাষাতাত্ত্বিক সাহিত্য সমালোচনা (linguistic criticism) এর আবশ্যিকতা বিষয়ে পরবর্তীকালে প্রকাশিত নবেন্দু সেনের 'গদ্য শিল্পী অক্ষয়কুমার দত্ত ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর' (১৯৭১) শীর্ষক গ্রন্থের মুখবন্ধে, তিনি মন্তব্য করেছেন— লেখক বিশেষের শব্দ ব্যবহার শব্দ গঠন, বাক্যগঠন, বাক্য সজ্জার মধ্যে তার ব্যক্তিত্বের কোন কোন রূপ, কোন কোন মানসিকতা

প্রতিফলিত হতে বাধ্য। উপাদানের মধ্যে পরিণত রূপের বীজ লুকিয়ে আছে। তাই ভাষার আলোচনা রচনারীতির মৌলিক কৌশলগুলি আবিষ্কারের শ্রেষ্ঠপথ। কিন্তু সাহিত্য তার উপাদান নির্ভর হওয়া সত্ত্বেও উপাদান-সর্বস্ব নয়, অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত শুধু ভাষাই সাহিত্য নয়। সেই জন্যই আলংকারিক পদ্ধতি ও ভাষাতাত্ত্বিক পদ্ধতির সম্মিলিত পথে সম্ভবত সাহিত্যিক রচনারীতি বিশ্লেষণের নতুন পথ পাওয়া যাবে।"[১১]

আবার আধুনিককালে শব্দের ধ্বনিগত রূপগত এবং অর্থগত বিচারের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং এর প্রতিটি ক্ষেত্রেই শৈলী বিজ্ঞানের বিশেষ অনুধাবণার অন্তর্গত। শব্দের পাশাপাশি শৈলীচর্চায় বাক্যগঠনের প্রতিও দৃষ্টিপাত প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে মনে পরে—

Syntatic structure শীর্ষক গ্রন্থে চমস্কি তাঁর সংবর্তনী সঞ্জননী ব্যাকরণ তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে, *Aspect of the theory of syntax* গ্রন্থে, তিনি বাক্যের অবয়ব বিষয়ে দুটি স্তর লক্ষ্য করেছিলেন। বহিরঙ্গ রূপ (surface syntax) এবং অন্তরঙ্গ রূপ (deep structure)। তিনি বলেছেন— (বচনে ও রচনে বক্তা বা লেখকের মনে ক্রিয়াশীল থাকে বাক্যের অন্তরঙ্গ রূপ। যদিও তার প্রকাশ ঘটে বহিরঙ্গরূপে। অর্থাৎ তিনি অন্তরঙ্গরূপের শব্দ তাত্ত্বিক এবং বহিরঙ্গ রূপের ধ্বনিতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করেছেন, সুতরাং কোন ভাষার সঞ্জননী ব্যাকরণ এক ধরনের নিয়ম প্রণালী যা অর্থ এবং ধ্বনির মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে।

"শৈলী বিজ্ঞান অর্থাৎ রীতি বিজ্ঞান (stylishtics) এদেশে বিশ্লেষণতত্ত্ব, রসতত্ত্ব ও ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অপরিচিত আগন্তুক বলে মনে হলেও প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য বিচার পদ্ধতিতে 'রীতি' কথাটি সুপরিচিত। লেখকের অন্তরশায়ী চেতনা, আবেগ ও কল্পনা ভাষায় প্রকাশিত হওয়ার জন্য বিশেষ ধরনের শব্দ প্রকল্প গ্রহণ করে। এক এক লেখকের এক এক ধরনের ভাষা প্রকাশ ভঙ্গিমা। আবার স্থান-কাল পাত্র ভেদে একই লেখকের রচনারীতির মধ্যেও নানা বৈচিত্র্য ঘটতে পারে। আলংকারিক বামন রীতির সংজ্ঞা দিয়েছিলেন 'বিশিষ্ট পদরচনা রীতি' বিশেষ ভঙ্গিতে শব্দ বিন্যাসই রীতি। এই ভঙ্গি বিষয়ভেদে, অবস্থাভেদে— এমনকি অঞ্চলভদেও পৃথক হতে পারে।"[১২] রীতিই যে কাব্যের আত্মা একথা অনেকেই মানেন না। অবশ্য শুধু রচনা রীতি ও ভাষাভঙ্গির তির্যকতারগুণে কোনো কোনো কবি দীর্ঘজীবী হন। যেমন অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙালি কবি ভারতচন্দ্র। আবার "ব্যক্তিভেদে ও ঐতিহাসিক ক্রমভেদে রচনা বৈচিত্র্যও ঘটতে পারে। যেমন— প্রাক্ শেকস্‌পিয়রিয় রীতি। মধ্যযুগীয় রীতি, কেল্টিক রীতি, গণনামাধ্যম রীতি, গীতিকবিতার রীতি ইত্যাদি। প্রত্যেক রীতিরই পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্য থাকে। এই প্রসঙ্গে জর্জলুই বুফোঁর (discourse sarle style 1753) গ্রন্থের বিখ্যাত উক্তি— 'Style is the man himself' মনে পড়বে। যথাস্থানে

যথার্থ শব্দ প্রয়োগকে 'le mot juste' ফ্লবেয়র শ্রেষ্ঠ রীতি বলেছিলেন। স্তাঁদালের মতে মনোভাবকে যথার্থ শিল্প রসে ফুটিয়ে তোলাই রীতির উদ্দেশ্য। শোপেন হাউয়ের মনে করতেন— স্টাইল হচ্ছে মনের ভাষা আশ্রয়ী বহিঃপ্রকাশ। কার্ডিনাল নিউম্যানও বলতে পারতেন চিন্তা ও চেতনাকে যথার্থ ভাষারূপ দেওয়াই শিল্পরীতির লক্ষণ। ভারতীয় আলংকারিক বামন রীতির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন, সে কথা তাঁর রীতিরাত্মা কাব্যস্য" বাক্য থেকেই বোঝা যাবে।"[১৩] আবার সংস্কৃত 'রীতি' ও ইংরেজি style-র মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে। সংস্কৃতিতে রীতি হচ্ছে স্বীকৃত শিল্পগুণের সমন্বয়ের দ্বারা গড়ে ওঠা বহিরঙ্গগত রচনা পদ্ধতি যা একান্তভাবে বস্তুগত। অপরদিকে, style হচ্ছে লেখকের ব্যক্তিসত্তার প্রতিফলন। সুতরাং বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে যে ভেদ, রীতি ও style-এর মধ্যেও সেই ভেদ বলে মনে করেন অনেকেই।

''১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে 'স্টাইলিস্টিক্' শব্দটি সাহিত্য শৈলীর বিজ্ঞান (The science of literary style) অর্থে, বিশেষ্য ও বিশেষণে অভিন্ন রূপ নিয়ে প্রথম ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। আর, ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ইংরেজিতে 'স্টাইলিস্টিকস্' শব্দটির প্রয়োগ শুরু হয়। 'ইংরেজি স্টাইলিস্টিক্সের পথ অনুসরণ করে বাংলা শৈলীবিজ্ঞান আমাদের সমালোচনা সাহিত্যে আধুনিক স্রোতের সৃষ্টি করেছে।' শৈলী বা স্টাইলের আলোচনায় ইংরেজি সাহিত্যে এবং অন্যান্য ইউরোপীয় সাহিত্যে, রোমান্টিক যুগের সূত্রপাতে এ জাতীয় নির্দেশনার অবসান ঘটে। রোমান্টিক যুগের অব্যবহিত পূর্বে, অষ্টাদশ শতকে, ড্রাইডেন (John Dryden) বলেছিলেন, ভাষা চিন্তার পোশাক (language is the dress of thought) এবং স্টাইল পোশাকের বিশেষ নির্মিত (style is the particular cut and fashion of the dress)। তার মতে, ভাষার বিশেষ নির্মিত তথা স্টাইল হবে সম্পূর্ণ বিষয়ানুগ, বিষয়ের বিভিন্নতা অনুসারে স্টাইলের প্রকারভেদ ঘটবে এবং স্বভাবতই স্টাইল হবে রচয়িতার ব্যক্তিক রুচির অনপেক্ষ। পরবর্তী শতকে, প্রতীচ্যে স্টাইল সম্পর্কিত এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটল, এবং অনেকেই কবি সাহিত্যিকের ব্যক্তিসত্তার বিশেষ প্রকাশকে স্টাইল বলে গ্রহণ করলেন।"[১৪]

আবার বিষয়ভেদে ভাষারীতির বিভিন্নতার বিষয়টি শৈলী বিজ্ঞানের বিশেষ মূল্য পেয়ে থাকে। তাহলে এ বিষয়ে আর সন্দেহ নেই যে— স্বাতন্ত্র্য স্টাইলের মূল ধর্ম। কিন্তু সেই স্বাতন্ত্র্য কৃত্রিম বা মিথ্যা হলে চলে না, সেটা অবশ্যই খাঁটি হওয়া চাই। কেননা, যদি কোনো ধার করা স্বাতন্ত্র্যের আশ্রয় নেওয়া হয়, তবে স্টাইলের মধ্যে কৃত্রিমতা দেখা যায়। আসলে খাঁটি সাহিত্যিকের স্বাতন্ত্র্য শুধু সাধনা সাপেক্ষ নয়, প্রকৃতিদত্তও বটে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যথার্থ সাহিত্যিক স্বাতন্ত্র্য বোঝার উপায় কি? এর উত্তরে বলা যায়, যদি কোনো সাহিত্যিক স্বাতন্ত্র্যকে স্বাভাবিক, অবশ্যম্ভাবী প্রয়োজনীয়

বলে মনে হয়, তবেই তাকে খাঁটি বলে গ্রহণ করা যাবে এবং সেক্ষেত্রে পাঠককে তাঁর বিচার বুদ্ধির ওপর নির্ভর করতে হবে। স্টাইল একান্তভাবে ব্যক্তিগত হওয়া সত্ত্বেও তাকে নৈব্যক্তিক না হলে চলে না। কেননা লেখকের রচনা যদি পাঠকের হৃদয়ে ভাব সঞ্চার করতে না পারে, তবে তা ব্যর্থ।

স্টাইলের তিনটি দিক আছে— বিষয়, চিন্তানুভূতি ও প্রকাশভঙ্গি। লেখকের প্রথমে কোনো বিষয় অবলম্বন করতে হয়, তারপর তাকে ব্যক্তিগত অনুভূতি ও চিন্তার রসে রসায়িত করে নিজস্ব ভাবকল্পনায় পরিণত করতে হয় ও সর্বশেষে উপযুক্ত আঙ্গিকের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হয়। সুতরাং সহজেই অনুমান করা যায় যে, বিষয়ের রূপ ও প্রকৃতির ওপর রচনার বৈশিষ্ট্য তথা স্টাইল অনেকখানি নির্ভর করে। তবে লেখকের ব্যক্তিগত অনুভূতি ও চিন্তার, একথায় অন্তঃসত্ত্বার গুরুত্বই সর্বাধিক।

উপরিউক্ত শৈলী সম্পর্কিত যে আলোচনা করা হল, সেটা অন্নদাশঙ্কর রায়ের প্রবন্ধের ক্ষেত্রে কতটা প্রযোজ্য, তা বিস্তৃত আকারে আলোচনা করা যেতে পারে।

অন্নদাশঙ্করের একই সঙ্গে এক অসাধারণ আঙ্গিক সচেতন, শৈলীকৃত এবং রূপদক্ষ শিল্পী। তিনি সৃষ্টি করতে পছন্দ করেন। তাই তিনি বিশ্ব স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করেছেন সৃষ্টি শক্তির একটি কণা। তাঁর কথায়—

‘‘জীবন দেবতার কাছে জীবনভর আমি যে তিনটি বর চেয়েছি তার প্রথমটি হলো ইলমিনেশন। আমার অন্তর যেন আলোয় ভরে যায়। বিশ্বরহস্য যেন আমি সেই আলো দিয়ে ভেদ করতে পারি। সমস্ত যেন আমার কাছে পরিস্কার হয়ে যায়। দ্বিতীয়টি হল প্রেম। আমার সত্তা, আমার হৃদয় যেন সুধারসে ভরে যায়। আমি যেন রসের আস্বাদন পাই ও দিই। আমার প্রেম সকলের প্রতি প্রসারিত হয়, সকলের মধ্যে যিনি ঊর্ধ্বে তাঁর সমীপে পৌঁছয়। তৃতীয়টি সৃষ্টির আনন্দ বেদনা। আমিও যেন কিছু সৃষ্টি করতে পারি।’’[১৫] এভাবেই একের পর এক সৃষ্টি করতে গিয়েই প্রাবন্ধিককে নানা প্রতিকূলতা কাটিয়ে উঠে শিল্প রক্ষা করতে হয়েছে। কারণ তিনি মানবিকতাবাদী। তিনি পলায়ণবাদী হতে চাননা। তাই তিনি চিরন্তন প্রশ্নের উত্তর কখনোই এড়িয়ে যেতে চাননি, কেননা, লোকে যদি পলায়ণবাদী ভাবে, সেই ভেবে। অন্নদাশঙ্কর রায় আজীবন ভেবেছেন ‘কেমন করে লিখব’র কথা। এই শৈলীর পরিপ্রেক্ষিতেই তিনি একদিকে রসিকের রসপ্রাপ্তির সৌরভ ও বিতরণকারী, অন্যদিকে ইনটেলেকচুয়ালের কর্তব্য পালনকারী। তিনি একই সঙ্গে ইনটেলেকটুয়াল ও আর্টিস্ট। তাঁর একহাত রসের জন্য লেখা, অন্যহাত দায়িত্বের জন্য।

বীরবল, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ, রোঁলা, গ্যেটে আরো কত মনীষীর প্রভাব যে অন্নদাশঙ্করের সাহিত্যে পড়েছে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। অন্নদাশঙ্করের শৈলীতে যে সরলতা ও বিশুদ্ধি লক্ষ্য করা যায়, সেই সরলতা ও বিশুদ্ধ উচ্চারণের কায়দাটা কিন্তু তলস্তয়ের

জগতের শিল্পাদর্শ থেকে নেওয়া। প্রাবন্ধিক তলস্তয়ের কাছ থেকে পান সত্যের প্রতি অনুরাগ, এপিকের প্রতি আকর্ষণ। তবে এপিকের যে আদর্শ, তার ধারণা অবশ্য তিনি রোলাঁর কাছ থেকেই পান। তলস্তয়ের মৃত্যুর পর বিবেকের উত্তরাধিকার যাঁদের উপর পড়েছিল তারা হলেন ভারতে গান্ধী ও ইউরোপে রোঁলা। বীরবলের গদ্য ও অন্নদাশঙ্কর রায়ের গদ্যের আলোচনা প্রসঙ্গে ধীমান দাশগুপ্ত মনে করেন—''বীরবলের গদ্যের সরলতা সত্ত্বেও যে অতিরঞ্জন আর আলংকারিতা, অন্নদাশঙ্কর কালক্রমে তা কাটিয়ে ওঠেন।''[১৬]

প্রমথ চৌধুরীর প্রধান আকর্ষণ তার রচনার স্টাইল বা রীতি। নতুন কিছু নতুন ঢঙে বলার চেষ্টা তাঁর রয়েছে। তিনি জানতেন লেখার ভিতর অহং না থাকলে সেটা সাহিত্য নয়। তিনি আরো বলেছেন— সমাজে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করা সামাজিক লোকের মতে দোষ হিসেবে গণ্য হতে পারে, কিন্তু মনোজগতে বাঁচতে হলে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করতেই হয়। তাঁর সাহিত্যে গতি রয়েছে। তাঁর মনের ধাত ও সাহিত্যিক মেজাজের মধ্যে একটা অনন্যতা আছে, অনন্যতা আছে চিন্তানুভূতির প্রণালীর মধ্যে। তাঁর মন চলতি বা গতানুগতিক মতের সঙ্গে পা ফেলে চলতে পারতো না। মনো ছবিটিকে তিনি অনন্য সাধারণভাবে পরিচালিত করতেন। ফলে বিচারের বিশ্লেষণে উপভোগে সৃষ্টিতে তাঁর নিজের মনের বিশেষ প্রকাশ, নিজের চিন্তা ও অনুভূতি সম্পন্ন অন্তঃসত্ত্বার বা Soul-এর বিশেষ অভিব্যক্তি উপলব্ধি করা যায়।

প্রমথ চৌধুরীর মনের প্রবণতা ছিল বিচিত্রমুখী। বাহ্যজ্ঞান সাধনা ও জ্ঞানের অন্তর্ভেদী রূপবিশ্লেষণই তাঁর জীবনের প্রধান নেশা ছিল। দেশ, সমাজ, যুগ, সাহিত্য, দর্শন, সঙ্গীত, ভাষা, শিক্ষা, সংস্কৃতি, প্রকৃতি ইত্যাদি কোনোদিকেই তাঁর আগ্রহের অভাব ছিল না। তাঁর প্রবন্ধ সাহিত্যে তাই বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য দেখা দিয়েছে। তার মানস রসের-জন্য অনেক সময় তাঁর মনের সংস্পর্শে এসে লঘু বিষয় গুরু হয়েছে, গুরু বিষয় লঘু হয়েছে। অতীত বিষয়ে বর্তমানের আলো ফেলে ও আধুনিক বিষয়ে অতীতের রূপ সন্ধান করে তিনি প্রকৃত পক্ষে বিষয়বস্তুর মধ্যেই নতুনত্ব এনে ফেলতেন। আসলে পরিচিত বিষয়কেও তিনি এমন যুক্তি শৃঙ্খলার (logical sequence) মধ্য দিয়ে পরিবেশন করতেন, যাতে পাঠকের কাছে তা নতুন বলে মনে হয়। তার প্রকাশ ভঙ্গি অন্যের থেকে আলাদা। অন্যদিকে তাঁর ভাষাভঙ্গির মধ্যে রয়েছে ধার ও উজ্জ্বলতা।

তাঁর রচনার গঠন-পরিপাঠ্য অনবদ্য। এলোমেলো ঢিলেঢালা ভাষার অন্তরে তিনি ভাবের দিব্যমূর্তি ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেননি, কারণ সে চেষ্টা ব্যর্থ না হয়ে পারে না। তিনি বলেন— ''প্রতি জীবন্ত ভাষারই একটি নিজস্ব গঠন আছে। সেই গদ্যরক্ষা করিতে না পারিলে আমাদের গদ্য স্বচ্ছন্দ হয় না।''[১৭]

সোজাভাবে না বললেও যে ভাষার জোর কমে যায়না তার প্রমাণ তাঁর সাহিত্য। রসিকতাচ্ছলে সত্যকথা বলতে চেষ্টা তাঁর। লোকের অন্তরে মিছরির ছুরি ঢুকিয়ে দেওয়াই তাঁর সাহিত্য রচনার অন্যতম উদ্দেশ্য। তাঁর ভাষা পেঁচালো ও জোরালো এবং 'রস ও কষ' যুক্ত। আসলে ভাষা সহজ সরল না হয়ে যদি একটু ঘোরানো বাঁকানো হয়, তবে কোনো না কোনো অলঙ্কার আসবেই। রচনার রূপগত, অর্থগত ও ধ্বনিগত সৌন্দর্য বৃদ্ধিই নিঃসন্দেহে তার উদ্দেশ্য। দু'একটি উদাহরণ—

১. ''আমরা বাঙালী মাত্রেই ঐ একই বিলেতি ক্ষুরে মাথা মুড়িয়েছি। শুধু কারও মাথায় কাকপক্ষ অবশিষ্ট; কারও মাথায় শুধু টিকি, যার যেটুকু অবশিষ্ট হয়েছে, তিনি সেইটেই স্বাধীনতার ধ্বজাস্বরূপ আস্ফালন করেন।''[১৮]

২. ''ইংরাজি শিক্ষার বীজ অতীত ভারতের ক্ষেত্রে প্রথম বপন করলেও তার চারা বাংলার মাটিতে বসাতে হবে; নইলে স্বদেশী সাহিত্যের ফুল ফুটবেনা।''[১৯]

Epigram (শ্লেষ) সৃষ্টিতে তাঁর আনন্দ ছিল বলে মনে হয়। যেমন— *আমরাও তোমরা* প্রবন্ধে antithesis এর প্রকাশ হলেও epigram-এর উপাদানও তাতে আছে। বীরবলী ধরনের অলঙ্করণের নিদর্শন— ''ধরাকে সরাজ্ঞান করা আমরা সকলেই উপহাসের বিষয় জ্ঞান করি, কিন্তু সরাকে ধরা জ্ঞান করা আমাদের কাছে একটা মহৎ জিনিস।''[২০]

আলঙ্কারিকতা বীরবলের গদ্যকে সর্বত্র সুন্দর করেনি। মনে রাখা চাই, রচনার প্রধানগুণ স্পষ্টতা। তাই বাক্যকে অলঙ্কৃত না করে নিরলঙ্কার রাখলেই স্থান বিশেষ অর্থ ভালো বোঝা যায়। অনেক সময় তিনি সহজ জিনিস বোঝাতে গিয়ে জটিল জিনিসের সঙ্গে উপমা দিয়েছেন। তার রচনার অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য— Paradox-এর খোঁচা দিয়ে আমাদের সহজেই ভাবাবেশ প্রবন সংস্কারাচ্ছন্ন, নিদ্রালু মনকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। কাব্যের বাঁশি বাজাতে নয়, গদ্যের অসি চালাতেই তিনি ছিলেন বেশি নিপুন। আমাদের মাথায় রাখা প্রয়োজন একজন লেখকের ব্যক্তিত্ব গদ্যে ধরা পড়ে যায়। কেননা, তা উপযোগ নির্ভর। ব্যক্তি জীবন সমাজ ভাবনা, দর্শন সম্পর্কে লেখক মন কতটা জিজ্ঞাসু তা তার গদ্যকে প্রচলিত ধারা থেকে পৃথক করে দেয়। এভাবেই বিভিন্ন লেখকের গদ্য নিজস্ব রূপ গড়ে তোলেন। অন্নদাশঙ্করের গদ্য এর বাইরে নয়। অন্নদাশঙ্কর নিজে প্রমথ চৌধুরীদের তাঁর গুরু মেনেছেন। ''তাঁর গুরুবাণীর বিশেষত্ব হল— কলকাতা নয়, কৃষ্ণনাগরিক ভাষাচর্চা, শব্দের ব্যাপারে শুচিবাই কখনো, এক বিশেষ ম্যানার অব থিংকিং, ম্যানার—অব ফিলিং অ্যাণ্ড ম্যানার অব এক্সপ্রেশন (এল.বি.বারোজ); এপিগ্রাম- অ্যান্টিক্লাইম্যাক্স-অ্যান্টিথিসিস, শব্দ শ্লেষ, মার্জিত রসিকতা এবং ভার্বাল উইটের চূড়ান্ত ব্যবহার। তবে তৃতীয় বৈশিষ্ট্যই অন্যগুলির

নিয়ামক।"[২১]

অন্নদাশঙ্করের গদ্যশৈলীতে 'প্রমথীয়' বিশেষত্ব অনেকবার দ্যুতি এনেছে। যেমন— ''যৌবনের সত্যিকার বিপদ মরা নয় জরা, বদলানো নয় বদ্ধ হওয়া, ভাঙা নয় বাঁকা, নষ্ট হওয়া নয় স্বভাবভ্রষ্ট হওয়া" এই ধরনের বাক্য পাঠকের কাছে খুব সহজেই পৌঁছে যায়। কেননা, এটি এপিকগ্রাম সুলভ। বক্তব্য রাবীন্দ্রিক, প্রকাশ ভঙ্গি প্রমথীয় অর্থাৎ প্রমথ চৌধুরীর ভাষার মতো। 'যৌবনের সত্যিকার বিপদ' শীর্ষক শব্দ-বন্ধ দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ বাক্যাংশে কর্তা হয়ে বসেছে। এবারে প্রশ্ন আসে অন্নদাশঙ্করের স্বকীয়তা তাহলে কোথায়? আসলে প্রমথ চৌধুরীর শব্দের উতোর চাপানের নাগরিক আবহাওয়া থেকে বাঁচার জন্য অন্নদাশঙ্কর লোক-ভাষার দিকে চোখ ফিরিয়েছেন। যা অন্নদাশঙ্করকে অন্যান্যদের থেকে আলাদা করেছে। তবে এক সময় অন্নদাশঙ্কর অনেকটাই প্রমথীয় ছিলেন। পরবর্তীতে অন্নদাশঙ্কর চাইলেন বাঙালীর সখের ভাষা। ইংরেজিও থাকবে, ফরাসীও থাকবে, আরবীও থাকবে, ফরাসীও থাকবে। থাকবে সংস্কৃতও। কিন্তু প্রধানত থাকবে দেশজ। থাকবে প্রাকৃত। তাই তিনি গুরুর কথা চিন্তা করে একান্ত দেশী শব্দমালা, বাক্যবন্ধ কিংবা প্রবাদ আন্তরিক ভাবে ব্যবহার করে চলেন।

অন্যদিকে অন্নদাশঙ্কর রায় রবীন্দ্রনাথের চলতি বাক্‌রীতির স্বাদু প্রভাবকে একদিকে স্নিগ্ধতা ও সরলতায়, অন্যদিকে বিশুদ্ধি ও মননে সঞ্চারিত করে গদ্যরীতির প্রধান দুটি ভাগকে আশ্চর্য মেলান। যেমন— ''আমার পথের আরম্ভ হলো শ্রাবণের এক মধ্যরাত্রে— তিথি মনে নেই, কিন্তু শুক্ল পক্ষের আকাশে চাঁদ ছিল না।"[২২] এর মধ্য দিয়েই আমরা বুঝতে পারছি যে, বাক্‌রীতির স্বাদু প্রভাবকে স্নিগ্ধতা ও সরলতায়, বিশুদ্ধি ও মননে সঞ্চারিত করে এক সুন্দর সমীকরণে অন্নদাশঙ্করের গদ্য শৈলী এগিয়ে চলে। শুধু তাই নয়, রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে তিনি পান সৌন্দর্যের প্রতি অনুরাগ, বিচিত্রের প্রতি আকর্ষণ। আর পান— 'কেন বাঁচব' ও 'কীভাবে বাঁচব' এ প্রশ্নের এক চমৎকার উত্তর।

গোপাল হালদার সচেতনভাবে যে সংস্কৃত ঐতিহ্য থেকে বেরিয়ে আসতে চান প্রাবন্ধিক অন্নদাশঙ্কর সেই ঐতিহ্য লালিত শব্দ সমূহকে সরল গঠনের বাক্যে সাজিয়ে সারস্বত রীতি ও চলতি রীতির মিল ঘটান। গোপাল হালদার এর *সংস্কৃতির বিবর্তন* গ্রন্থের *ইসলামের স্বাতন্ত্র্য* নামক একটি অধ্যায়ের কিছুটা অংশ তুলে ধরা হল— ''প্রত্যেক ধর্মেরই জন্ম হয় অনেকাংশে পারিপার্শ্বিকের তাগিদে; অন্তত সেই পরিবেশের ছাপ তাহার নিজস্ব হইয়া যায়। স্থান ও কাল পরিবর্তিত হইলেও সেইগুলি সে সম্পূর্ণ কাটাইয়া উঠিতে পারে না।"[২৩] কিন্তু অন্নদাশঙ্কর রায়ের গদ্য সরল বাক্যের গদ্য। অল্প কথায় অনেক ভাব ফুটিয়ে তোলেন এবং পাঠককে কোথায় যেন ভাববার উৎস জুগিয়ে

দেন। একটি উদাহরণ— ''পৃথিবীর ইতিহাসে প্যারীর তুলনা নেই। দুই হাজার বৎসর তার বয়স। তবু চুল তার পাকলো না।''[২৪]

অন্যদিকে ''সুধীন্দ্রনাথের গদ্য যুক্তি মেনে যতটা দুরূহ, এ গদ্য যুক্তি মেনে ততটাই সরল। আর তাঁর যুক্তিক্রম, ইংরেজিতে বললে, Consecutiveness ও Concurrentness এর সুন্দর মিশ্রণ।''[২৫]

আবার অন্নদাশঙ্করের শৈলীতে গান্ধীজীর যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। প্রাবন্ধিক গান্ধীজীর প্রভাবে পড়ে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে জনগণের জীবনের শরিক হওয়ার বাসনায় মগ্ন হন। যে টানাপোড়েন সাহিত্য জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে শৈলীকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। তলস্তয়ের সত্যানুরাগ, রোঁলার নীতিগুণ, গ্যেটের স্থিত-প্রজ্ঞা, গান্ধীজীর জনগণ, রাসেলের দায়িত্ববোধ, লালনের উত্তরাধিকার— বিশুদ্ধ শিল্পের দাবি যখন অন্নদাশঙ্করকে এইসব বোঝার একাধিক দায়িত্ব নামাতে বাধ্য করে, তখন তিনি জনগণের বোঝাটিই নামান সর্বপ্রথম। কিন্তু যে জনসাধারণের কাছ থেকে তিনি এত কিছু পাচ্ছেন, নিচ্ছেন, তার বদলে তাদের দেবেন কী? যারা তাঁকে খাইয়ে পরিয়ে আরামে আয়েসে বাঁচিয়ে রেখেছে, তাদের শ্রমের ঋণ তিনি শোধ করবেন কী উপায়ে। তিনি তো চাষী বা কারিগর বা মজুর নন। প্রধান অর্থ দিয়ে শোধ করা যায় না। সেই জন্যে গান্ধীজি বলেছিলেন সুতো কেটে তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাদের ঋণ শোধ করতে। কায়িক শ্রমে লেখকের মন নেই। জোর করে চরকা কেটেছেন, ছেড়ে দিয়েছেন। পিতৃ ঋণ, ঋষি ঋণ ইত্যাদির মতো শ্রমের ঋণ তিনি শোধ করতে পারবেন না। কোনো মতেই সে সব রচনা সহজ বোধ্য হবে না। সহজ বোধ্য করতে গেলে দুটোর সঙ্গে জল মেশাতে হবে। সেটা লেখকের নীতি নয়। তাহলে তিনি কী করবেন? তিনি ছড়া লিখবেন। অর্থাৎ সকলের উপযুক্ত করে কিছু লেখার জন্য এক প্রকার জনসাহিত্যের মতো তিনি ছড়াকে নিয়েছিলেন এবং এক দিক থেকে দেখলে তাঁর ছড়ায়, সাহিত্যে গান্ধীর প্রভাব পড়ে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে জনগণের জীবনের শরিক হওয়ার বাসনার সফল প্রকাশ ঘটেছে।

''লেখকের অন্যতম প্রধান এক থিম, শাশ্বত নারীর ধারণাটি, আসে, তার গ্যেটের কাছ থেকে— 'The eternal-womanly drawsus above' তেমনি আর্টের ধারাণায়, রসের ধারণায়, দ্বিতীয় যৌবনের ধারণায়, তিনি প্রমথ চৌধুরীর ভাবশিষ্য।''[২৬] এভাবেই গড়ে উঠে অন্নদাশঙ্করের অখণ্ড দর্শন— ''বার্ট্রান্ড রাসেলের দর্শনের উদ্দেশ্য ছিল মিস্টিসিজমের সঙ্গে যুক্তির সম্মেলন, যাকে তিনি লজিক্যাল মিস্টিসিজম বলেছেন ও যার মধ্যে তিনি পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মূল সূত্র দেখতে পেয়েছিলেন। ঈশ্বর উপলব্ধির কথা তিনি তোলেননি। অন্নদাশঙ্কর কিন্তু ঈশ্বর উপলব্ধির কথা তুলেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল হয়তো মিস্টিসিজমের সঙ্গে মনন প্রকৃতির (বিচারকসুলভ মনোবৃত্তি,

মার্জিত রুচি ও শান্ত অথচ শাণিত বুদ্ধির দীপ্তি) সমন্বয়, যার মধ্য দিয়ে তিনি ভারতীয় সাহিত্যশাস্ত্র ও অভিজাত-সংস্কৃতির মূলসূত্রকে হয়তো পেতে চান।"[২৭]

তিনি নিজেই বলেছেন— এই অখণ্ড সৃষ্টির জন্য সকলের বিজ্ঞান, ধর্ম, নীতি ও দর্শনের সাহায্য নিতে হবে। তবে শিল্পীর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি যেন আচ্ছন্ন বা বিভক্ত না হয়।

অন্নদাশঙ্করের আঙ্গিক সচেতন জীবন চর্চার কথা বলতে গেলে বলতে হয়, তাঁর আঙ্গিক চেতনা শুধুমাত্র শিল্পরূপ ও শিল্পদর্শন নয় অনেকটা জীবনচর্চা পর্যন্ত প্রসারিত। অন্নদাশঙ্কর লীলা রায়কে যে পার্সোনাল নোট দিয়েছিলেন তাতে বলেছিলেন, তাঁদের জীবন সঙ্গিনীরা তাঁদের কাছ থেকে পাবে এক রূপদক্ষ শরীর ও সদীক্ষিত মন।

এবার আমরা দেখব প্রাবন্ধিকের শব্দচয়ন ও বাক্যচিন্তা কেমন। অন্নদাশঙ্কর রায়ের গদ্য মননশীল বিশ্বাসের রচনা। তিনি বুদ্ধিজীবী ও মরমী। তাঁর গদ্য মিস্টিক বুদ্ধিজীবীর গদ্য। *আমার লেখক সত্তা* প্রবন্ধে শব্দের কতটা শক্তি থাকতে পারে সেটা জানিয়েছেন। তাঁর শব্দ নির্বাচনে নেই কোনো গোঁড়ামি বরং রয়েছে সমন্বয়ের স্বাধীনতা। চলতি বাংলা শব্দ, দেশি শব্দ, বাংলা হরফে ইংরেজি শব্দ এবং বিষয়ের গুরুত্ব অনুযায়ী আরবি, ফারসি ও বিদেশী শব্দকেও লেখায় তুলে ধরেছেন। তবু তৎসম শব্দের অবিরল ব্যবহার তাঁর সাহিত্যিক ঐতিহ্যকেই মনে করিয়ে দেয়। যেটা গোপাল হালদার পারেনি।

অন্নদাশঙ্করের বাক্যকাঠামোয় ইংরেজি বাক্য গঠনের সচেতন প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য সেটা কখনো শ্রুতিকটু হয়ে আসেনি। মোট কথা তাঁর গদ্যরীতির এক উল্লেখযোগ্য দিক হল এর সংলাপরীতি। দীর্ঘ, সংলগ্ন, কখনো ঈষৎ শিথিল সেই সংলাপের সুর। নাগরিক কথোপকথনতা, পরিশীলিত ও মননশীল, নিরপেক্ষ আবেগ ও বুদ্ধির খেলা সেই কথোপকথন। অনুপ্রাস আসে, আসে হিউমার, কখনো কথার জন্য কথা, কিন্তু সর্বত্রই ও সর্বদাই এক শৈল্পীক প্রয়োজন বা নান্দনিক তৃপ্তির হাত ধরে আসে তা। সেখানেও সরলতার স্বাদ। স্বাদ বিশুদ্ধির।

''সরল বাক্য গঠনের দিকেই তাঁর ঝোঁক বেশি। এর পাশ্চাত্যে রয়েছে একটি ঘটনা। জটিল বা যৌগিক বাক্যকেও প্রায়ই তিনি সরলে ভেঙে দিতে চান। জটিল বাক্যের ক্ষেত্রে সংযোগকারী শব্দগুলিকে রাখতে চান সরল। বাক্যক্রমের ক্ষেত্রে যুক্তিক্রম মেনে চলে তাঁর গদ্য।"[২৮] ফলে অন্নদাশঙ্করের ক্ষেত্রে তাঁর জীবন ও শিল্পের যে চূড়ান্ত সমীকরণ ঘটে তাকে শিল্পীর চেয়ে বড় করে তোলে, নান্দনিক জীবন শিল্পী, সেই জীবনিশিল্পের যে সংজ্ঞা তিনি নির্দেশ করেছিলেন তাও বিশেষভাবেই শৈলীবৃত। মোট কথা শিল্পী না হয়েও একজন হতে পারেন জীবনীশিল্পী যদি তাঁর জীবনটা হয় একটা সমগ্র ও অখণ্ড ব্যাপার, সেখানে কোনো ভাঙাচোরা নেই, অন্তঃবিরোধ নেই,

অসংগতি নেই। সমালোচকের ভাষায়—

''জীবনটা একটা শিল্প কর্মের বা একখানা গানের মতো সুসংগত ও সযত্ন রচিত। সংগীতের নিয়ম মেনে, সংযম রক্ষা করে, নিষ্ঠার সঙ্গে ও অন্তর থেকে যে গানখানি গাওয়া। যাতে প্রতিদিনের প্রত্যেক কাজ পরস্পর সংগত হয়েছে, সবটা মিলিয়ে হয়েছে চমৎকার একটা ঠাসবুনন। তাতে অবান্তর কিছু থাকেনি, অভাবও থাকেনি কিছুর। জীবনকে পরতে পরতে পর্বে পর্বে আপন কণ্ঠে গাওয়া হয়েছে, আপন হাতে সাজানো হয়েছে। অন্নদাশঙ্কর এইভাবে একই সঙ্গে শিল্পী ও জীবন শিল্পী! রবীন্দ্রনাথের মতো। তাঁর জীবন 'কেন বাঁচব' ও 'কেমন ভাবে বাঁচব'-এ প্রশ্নের এক চমৎকার উত্তর। এই রকমই শৈলীকৃত তাঁর জীবনচর্যা।''[২৯]

অন্নদাশঙ্কর রায় মনে করেন শিল্পে কী বলেছে ও কেমন করে বলেছেন সঙ্গে কে বলেছে সেটাও সমান জরুরী।

সেজন্য কেন লিখব—

''কী লিখব

কেমন করে লিখব— সূচনার এই কথার সমাপ্তি বিবর্তন পেল।

কি লিখেছে

কেমন করে লিখেছে

কে লিখেছে তে।''

কে লিখেছে এই প্রশ্নটির উত্তর এখানে হল— অন্নদাশঙ্কর লিখেছেন।

'বিনুর বই' (প্রথম পর্ব) এর শেষে প্রাবন্ধিক লিখেছিলেন— ''শেষ নয়, অশেষ। তবু এখনকার মতো শেষ। ... বিনু, তুমি কথা বলার আর্ট শিখেছ। না-বলার আর্ট শেখো।''[৩০] ''যে উদ্ধৃতি থেকে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি তাঁর আঙ্গিক চেতনা কীভাবে উপাদান থেকে পদ্ধতি হয়ে উঠে শেষ পর্যন্ত সমগ্র অন্নদাশঙ্করের সূচক রূপেই কাজ করে।''[৩১]

এবারে প্রাবন্ধিক অন্নদাশঙ্করের প্রবন্ধের উদাহরণ সহযোগে শৈলী ও আঙ্গিক কত বিচিত্র ধরনের তা নিম্নে আলোচনা করা যেতে পারে। তাঁর গদ্য দৃষ্টিলব্ধ বিষয়কে বুদ্ধি গ্রাহ্য বিষয়ে রূপান্তরিত করে নেয় এবং তার আবেদন অতিসহজেই পৌঁছে যায় পাঠকের বুদ্ধির কাছে। মনে আনন্দ জাগায়। যেমন— ''সকল বাবুয়ানা সত্ত্বেও ইংরেজরা হিসেবী জাত, যেমনি ফুর্তিধরে তেমনি খাটে এবং খাটুনির অর্জন থেকে যতটা ব্যয় করে ততটার বহুগুণ সঞ্চয় করে।''[৩২]

এরপর আর বোঝার অবকাশ থাকে না যে, দৃষ্টিলব্ধ বিষয় কীভাবে বুদ্ধিগ্রাহ্য বিষয়ে পরিণত হয়। আর একটি উদাহরণ—''ছেলে বেলা থেকেই আমার খুব বই পড়ার শখ। যখন যে বই হাতে

পেতুম সেটাই পড়তুম। পাঠ্য অপাঠ্য বাছ বিচার করতাম না। পঞ্জিকার বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠা ছিল আমার প্রিয় পাঠ্য।"[৩৩] প্রাবন্ধিকের বলার ঢং হৃদয়গ্রাহী, ভাষার গতি দ্রুত। মোটকথা যে কথা যেভাবে বলা উচিত প্রাবন্ধিক ঠিক সেভাবেই বলেন। যুক্তিতর্কের ক্ষেত্রেও ভাষা তুখোড়, তাঁর ভাষা ঝকঝকে, রচনার প্রসাদগুণে বক্তব্যও তেমনি জ্বলজ্বলে, ঝলমলে। কয়েকটা উদাহরণ এখানে দেওয়া হল—

ক. ''পোর্ট সৈয়দ ছেড়ে আমরা ভূমধ্যসাগর পড়লুম। শান্তিশিষ্ট বলে ভূমধ্যসাগরের সুনাম আছে। প্রথম দিনকতক চতুর ব্যবসাদারের মতো ভূমধ্যসাগর Honesty is the Best Policy করলে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভদ্রতা রক্ষা করলে না। আর একবার করে কেউ কেউ শয্যাশায়ী হলেন। অধিকাংশকেই মার্সেলস-এ নামতেই হল। পোর্ট সৈয়দ থেকে মার্সেলস পর্যন্ত জল ছাড়া দুটি দৃশ্য ব্যতীত দেখবার আর কিছু নেই। প্রথমটি ইটালী ও সিসিলির মাঝখানে মেসিনা প্রণালী দিয়ে যাবার সময় দুই ধারের পাহাড়ের সারি দ্বিতীয় ট্রাম্বোলী আগ্নেয়গিরির কাছ দিয়ে যাবার সময় পাহাড়ের বুকে রাবণের চিতা।"[৩৪]

''পোর্ট সৈয়দ, ভূমধ্যসাগর, মার্সেলস মেসিনা প্রণালী, প্রভৃতির ভৌগোলিক গুরুত্ব ছাপিয়ে উপরোক্ত বর্ণনা অন্য এক ব্যঞ্জনা এনে দেয় পাঠকের মনে। 'চতুর ব্যবসায়ী'। 'Honesty is the Best Policy' 'রাবণের চিতা, প্রভৃতি বাক্যাংশ তার বক্তব্য প্রতিপাদনে সমর্থ হয়েছে। এই কারণে প্রমথ চৌধুরী পথে প্রবাসের ভাষাকে জড়তা মুক্ত নির্বাধ গতি সম্পন্ন ভাষা বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন, ''এই নবীন লেখকের ইন্দ্রিয় ও মন দু-ই সমান সজাগ, তাঁর চোখে ও মনে যা ধরা পড়ে তখনই তা ভাষাতেও ধরা পড়ে।"[৩৫]

খ. ''নিবিড় আকুল আকাশে সেটি একটি পর্বত দিগবলয়িত নিরালা তুষারদ্বীপ, তার মাটি বরফের মেঘ বরফের; তার জল-স্থল অন্তরীক্ষের ভিৎ দেয়াল ছাদ মর্মরনিভ বরফের। যেন আকাশ সিন্ধুর ঢেউয়ের পর ঢেউ পাহাড়ে হয়ে উঠেছে আর ফেনায় ফেনায় মাটির বেলা ঢেকে গেছে। সে আকাশ এত নীল, আর এত উজ্জ্বল আর এত সুন্দর যে চাতকের মতো দিবারাত্র অনিমেষ চেয়ে থেকে সাধ মেটে না, মনে হয় এ এক মহার্ঘ বিলাসিতা, শুধু এরই জন্যে এক সমুদ্র একাধিক নদী পেরিয়ে ফ্রান্সের এক সীমানা থেকে আরেকটি সীমানা অবধি রেল দৌড় দিয়ে সুইস আল্পসের শাখা শিখরে উঠতে হয়।"[৩৬]

এখানে প্রকৃতি বর্ণনায় লেগেছে কবিত্বের রঙ, সৌন্দর্যের স্নিগ্ধ পরশ। অন্নদাশঙ্কর জানতেন কিভাবে বললে তা পাঠকের হৃদয়গ্রাহী হবে। তাই আগের উদাহরণে ভাষার গতি ছিল দ্রুত, কিন্তু এখানে গতি হয়েছে মন্থর।

গ. ''বেলজিয়াম বলে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৩০ সালে। তার রাষ্ট্রভাষা হয়

ফরাসি। দশটা বছর যেতে না যেতেই ফ্লেমিশদের দিক থেকে প্রতিবাদ ওঠে। তারাও তো বেলজিয়াম। তবে তাদের ভাষা কেন ফরাসির সমান মর্যাদা পাবে না?"[৩৭]

অন্নদাশঙ্কর রায় প্রমথ চৌধুরীর গদ্যরীতির অনেকটাই অনুসারী। যেমন কোন কিছুর সাথে কোনোকিছুকে তুলনা করার প্রসঙ্গ প্রমথচৌধুরীর মতো অন্নদাশঙ্করের প্রবন্ধেও রয়েছে। যেমন— ''তোমরা বিদেশে ছুটে বেড়াও, আমরা ঘরে শুয়ে থাকি। আমাদের সমাজ স্থাবর, তোমাদের সমাজ জঙ্গম।"[৩৮] অন্নদাশঙ্কর রায় বলেন— ''ইউরোপের ধাত বিশ্লেষণ শীল, এশিয়ার ধাত সংশ্লেষণশীল। ইউরোপের কীর্তি বিজ্ঞানে, এশিয়ার কীর্তি যোগে। ইউরোপ বিনা পরীক্ষায় কিছু মানে না। পরীক্ষার পর যা মানে তার বাইরে সত্য খুঁজে পায় না। আমরা অম্লানবদনে সব মেনে নিই। অধিকারী ভেদে মিথ্যাকেও বলি সত্য। ইউরোপ বিশ্বাস করে যোগ্যতম উদ্‌বর্তনে, আমরা বিশ্বাস করি সমন্বয়ে।"[৩৯]

অন্যদিকে অরুণকুমার বসুর মতে— ''সমান্তরলতা অন্নদাশঙ্করের একটি বিশেষগুণ।"[৪০] যেমন— 'কলকাতার নাই শিল্পের চেয়ে বম্বের কানা শিল্প ভালো।"[৪১] কিংবা ''গণতন্ত্রের বিবেক বন্ধক দেওয়া হয়েছে মন্ত্রিমণ্ডলীর কাছে, আর গণতন্ত্রের কৃষি বন্ধক দেওয়া হয়েছে লার্জ-স্কেল ম্যানুফ্যাকচার-ওয়ালাদের কাছে।"[৪২] এভাবেই সমগঠনের আন্বয়িক উপাদান গদ্যে সৌষম্যের সৃষ্টি করেছে। অন্যদিকে আবার বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্য রেখে গদ্য তৈরী অন্নদাশঙ্করের শৈলীর একটি অন্যতম দিক। যেমন— ''কিন্তু সেই দরকারটা চরম হল, সৌন্দর্য হল অবান্তর। তাই দেখি প্রশস্ত পরিচ্ছন্ন বাঁধানো পথঘাট, বাতায়নবহুল উপকরণাঢ্য পরিপাটী বাড়িঘর, কিন্তু রাস্তার সব কটা বাড়ি একই ধাঁচের, একেবারে হুবহু এক, যেন ছাঁচে ঢালা সীসের টাইপ। এরা সৈনিক নাবিকের জাত, কচি বয়স থেকে ড্রিল করতে অভ্যস্ত, সারি বেঁধে গির্জেয় যায়, সারি বেঁধে ইস্কুল থেকে ফেরে, এদের চালে চলনে উঠতে বসতে ড্রিল। তাই এদের বাড়িঘরগুলো পর্যন্ত লাইন বেঁধে পরস্পরের সঙ্গে সমান ব্যবধান রেখে য়্যাটেশানের ভঙ্গিতে খাড়া, তাদের সকলের গায়ে ইউনিফর্ম, তার একই মাপ একই রঙ একই রেখা একই গড়ন। চোখের ক্ষুধায় ক্ষুধার্ত হয়ে তাকাই আর ক্ষোভে নৈরাশ্যে মারিয়া হয়ে উঠি। শুনলুম সমগ্র ইংল্যাণ্ড নাকি সপ্তাহের একই বারে কাপড় কাচতে দেয়, একই বারে কাপড় ফিরে পায়।"[৪৩]

যে Wit বা বাগ বৈদগ্ধ্য প্রমথ চৌধুরী বা ভারতচন্দ্রের রচনায় পাওয়া যায় সেই wit এর নিদর্শন মেলে অন্নদাশঙ্করের রচনায়—

১. ''জীবনের চেয়ে জরা ব্যাধি মৃত্যুই বেশি, তবুও অপরিসীম জীবন, সেই অপরিসীমতাকে বলি যৌবন।"[৪৪]

২. ''হাতের দাসত্বের চেয়ে মাথার দাসত্বের বাজার দর বেশি।"[৪৫]

৩. ''নারীকে অবরুদ্ধ রেখে আমাদের দেশের পুরুষ নিজের চোখের জ্যোতিকে নিজের হাতে নিবিয়েছে।''[৪৬]

৪. ''নারীর নারীত্বও যে সাগরতলের চেয়েও অতল, পরিবর্তন সে তো জলপৃষ্ঠের বুদ্বুদ।''[৪৭]

৫. ''প্রকৃতি আমাদের দয়া করে যে সুধাটুকু দিয়েছে সভ্যতা তার পরিমাণ বাড়াতে পারেনি।''[৪৮]

৬. ''সূর্যের আলোর অভাবে গ্যাসের আলো ছুঁইয়ে মনের বৃন্তে ফুল ধরাতে পারিনে।''[৪৯]

''কথ্য ক্রিয়াপদ ব্যবহারকেও অন্নদাশঙ্করের গদ্যরীতি একটি আন্বয়িক প্যাটার্ন তৈরী করে দেয়। সম ক্রিয়ারূপের একাধিক উদাহরণে তিনি বাক্যগুলিকে মালার মতো সাজিয়ে দেন।''[৫০] যেমন—

''খ্রিস্টমাস ইভে খ্রিস্টমাস ট্রি স্থাপন হল, ট্রির উপরে শতসংখ্যক মোমবাতি জ্বলে উঠল, রোগীদের শয্যাসমেত বয়ে এনে সারি সারি সাজিয়ে রাখা গেল, তাদের বন্ধুবান্ধবীরা সারি বেঁধে বসলেন, কনসার্ট চলল, ধর্মোপাসনা হল, প্রসিদ্ধ ফরাসী গ্রন্থাকারের স্ত্রী মাদাম দুয়ামেল আবৃত্তি শোনালেন। ... বাতি নিবল, কনসার্ট থামল, উৎসব শেষ হল রোগীরা নিজ নিজ ঘরে ফিরলে... খ্রিস্টমাস ইভ খ্রিস্টমাস ট্রির পুতুল ঝুলছে, ইলেকট্রিক আলোর নকল মোমবাতি জ্বলছে, ইংরেজ জার্মান ফরাসী ইতালিয়ান ইত্যাদি নানাজাতের নানাভাষী রুগণ ছেলেমেয়েগুলি এক একটি শয্যায় দুজন করে শুয়েছে, তাদের আত্মীয়েরা তাদের বিছানার কাছে বসে তাদের আনন্দে যোগ দিচ্ছেন, নার্সরা পিয়ানো বাজাচ্ছে।''[৫১]

আবার অন্নদাশঙ্কর রায়ের রচনার মিলে কাব্যিক শব্দের সম্ভার— ''সে এক তুষারময় স্বপ্ন, যেন নিসর্গের তাজমহল''[৫২] ঝক্‌ঝকে আধুনিকতা কীভাবে তাঁর গদ্যকে ছন্দময় করে তুলেছে তার একটি উদাহরণ ''সেই ট্রাম সেই বাস সেই ট্যাক্সি সেই ট্রেন সেই গলি সেই বস্তি সেই মাঠ সেই প্রাসাদ।''[৫৩] বাক্য গঠনে এই হল অন্নদাশঙ্কর রায়ের নিজস্ব শৈলী।

''কখনও হ্রস্ব বাক্য কখনও দীর্ঘ বাক্য, উভয় ধরনের বাক্যের জোড় কলমেই অন্নদাশঙ্করের গদ্যরীতি গড়ে উঠেছে।''[৫৪] উদাহরণ—

''লণ্ডন শহর টেমস নদীর কূলে।''[৫৫]

''আমার চোখ এগিয়ে চলল।''[৫৬]

''সূর্য বিদায় নিলে চন্দ্রের পালা।''[৫৭]

''ভিয়েনার সঙ্গে তার আশপাশের সঙ্গতি নেই।''[৫৮]

''এর পরিণাম জীবনে বিরক্তি।''[৫৯]

এগুলি সরল বাক্য। লেখক জটিল বাক্য ও যৌগিক বাক্য উভয় জাতীয় বাক্যেই দীর্ঘায়ত

বাক্য-বন্ধ গঠন করতে ভালোবাসেন। এরূপ দু-একটি মিশ্র বাক্যের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে—

''তাদের আহ্বান যদি নাই শুনি, যদি কোনো একটা রাস্তা ধরে খ্যাপার মতো যেদিকে খুশি পা চালাই, তবে মানব-মানবীর শোভাযাত্রা থেকে কত রঙের পোশাক কত ভঙ্গির সাজ কত রাজ্যের ফুলের মতো মুখ আমার চোখ দুটিকে এমন ইঙ্গিতে ডাকবে যে, মনটা হাল ছেড়ে দিয়ে ভাববে, এর চেয়ে চুপ করে ঘরে বসে ভ্রমণকাহিনী লেখা ভালো, বৈরাগ্যবিলাসীর মতো সমস্ত ইন্দ্রিয় নিরুদ্ধ করে সর্বপ্রলোভনে অতীত হওয়া ভালো, সুরদাসের মতো দুটি চক্ষু বিদ্ধ করে ভুবনমোহিনী মায়ার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া ভালো।''[৬০]

অন্নদাশঙ্করের গদ্যে কথ্য বাক্য ও লিখ্য বাক্য কীভাবে মিলেমিশে থাকে তাঁর একটি নমুনা এখানে দেওয়া হলো—

''আমি ঘরে বসে লিখছি, আমার চোখজোড়া অশ্বমেধের ঘোড়ার মতো ভূ-প্রদক্ষিণে বেরিয়েছে। প্রথমে যেখানে গেল, সেটা আমাদের বাড়ির পাশের টেনিসকোর্ট, সেখানে যুবক-যুবতীরা লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটে ছুটে হেসে হেসে খেলছে। যে দুটো জাতি পরস্পর থেকে শতহস্ত ব্যবধানে থাকা উচিত, সেই দুটো জাতি যে বয়সে মানুষের শিরায় শিরায় ভোগবতীর বন্যা ছোটে সেই বয়সে কেবল যে স্বাস্থ্যের জন্যে শীতবাতাণের মধ্যে আঁধার আকাশের তলে খেলা করছে তা নয়, সেই সঙ্গে এত প্রচুর হাসছে যে ভারতবর্ষের লোক মোহমুদগরের আমল থেকে আজ অবধি সব মিলিয়ে এত হাসেনি। আমার চোখ ঘরের জানলা ছেড়ে রাস্তায় নামল। আমাদের পাড়ার বাড়িগুলো এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা ঘুমন্ত বকের মতো নিস্তব্ধতা। এটা একটা শহরতলী। সামনের বাড়ির ঝি মাটিতে হাঁটু গেড়ে কোমরে কাপড় জড়িয়ে সিঁড়ির উপর ন্যাতা বুলোচ্ছে, তার হাত প্রতি দেশের নারীর কল্যাণী হাত, ধূলা যার স্পর্শ পেয়ে প্রত্যহ শুচি হয়।''[৬১]

আমরা অন্নদাশঙ্কর রায়কে একজন পাকা ছন্দ শিল্পী ও গদ্যশিল্পী বলতে পারি। তাঁর গদ্যশিল্পের একটা বিশেষ প্রকাশ দেখা যায় তাঁর প্রবন্ধ রচনায়। এখানেও তাঁর স্বকীয়তা স্বতোভাস্বর। তাঁর গদ্য রচনার যে বিশিষ্টতা তা তাঁর ব্যক্তিত্ব ও মনস্বিতারই প্রকাশ। তাঁর গদ্য স্মার্ট ও বুদ্ধি দীপ্ত, একটি উদাহরণ—

''যন্ত্ররাজ বিভূতির কল্যাণে একালের রাম-শ্যামও সেকালের রাজ রাজরাদের চেয়ে স্বচ্ছন্দে আছে। কিন্তু রামের সঙ্গে শ্যামের এক তিলও তফাত নেই; রামের নাম ৪৬ ক তো শ্যামের নাম ৪৭ ক; নামের তফাৎ নেই; সংখ্যার তফাৎ''।[৬২] আবার ''বাক্যগঠনে সরল জটিল যৌগিক বিভিন্ন ধরনের বাক্য-দৃষ্টান্ত ছড়াতে ছড়াতে তাঁর গদ্য এগিয়ে চলে। ভৌগোলিক স্থানের উপর তিনি নায়িকার ধর্ম আরোপ করে তাকে রোমান্টিক কবিতার উপাদান করে তোলেন।''[৬৩] যেমন এই জটিল বাক্যটি:

''চিল্কার সঙ্গে এবার আমার দেখা আঁধার রাতের শেষ প্রহরে, সুন্দরী তখন আলোর স্বপ্ন দেখছে, তার দিগন্তজোড়া চোখের পাতায় যোগমায়ার আগুন শ্বেতাভ হয়ে আসছে।''[৬৪]

''আবার অস্ত্যর্থক-নঞর্থক সরল বাক্যযোগে যৌগিক বাক্যের সুচারু বিন্যাস অনেকগুলিই কলমের মুখে সহজে উঠে এসেছে।''[৬৫] যেমন—

''তমাল বন দেখতে পেলুম না। কিন্তু চিল্কা থেকে গোদাবরী পর্যন্ত— হয়তো আরো দক্ষিণেও তালী বনের অন্ত নেই।''[৬৬]

''পথের অন্যধারে ক্ষেত, কিন্তু বাংলার মতো তরল হরিৎ নয়।''[৬৭]

আপাতদৃষ্টিতে সাধারণ বর্ণনা, কিন্তু বাক্যের প্যাটার্নগুলি এক জাতীয়। প্রথমে একটি অস্ত্যর্থক বাক্য, পরে নস্ত্যর্থক বাক্যাংশ। আরও দু-একটি উদাহরণ:

''একালের কুমারীদের অনেক দুঃখ থেকে অব্যাহতি মিলেছে, সেইজন্যে তারা বিবাহের জন্যে কেঁদে মরছে না।''[৬৮]

ইউরোপের রিলিজন ইউরোপের লাইব্রেরী-ল্যাবরেটরী-স্টুডিও-স্টেডিয়াম থেকেই ভূমিষ্ঠ হবে, গির্জা-মসজিদ-মন্দির থেকে নয়।''[৬৯]

ফরাসী মেয়েদের দেখলে যেমন মনে হয় সারাক্ষণ পুষি মেনির মতো শরীরটিকে ঘষে মেজে সাজিয়ে রেখেছে, জার্মান মেয়েদের দেখলে তেমন মনে হয় না।''[৭০]

''গ্রাহককে খুশি করতে ইংরেজ দোকানদার প্রাণপণ করে। কিন্তু দেনা-পাওনা ভোলে না, আত্মীয়তা করে না।''[৭১]

চলিত ভাষার ক্রিয়াপদে 'লাম' এর পরিবর্তে 'লুম' ব্যবহার করে ভাষাকে সহজ হৃদয়গ্রাহী করে তোলার সচেতন প্রয়াস অন্নদাশঙ্করের গদ্যে লক্ষ্য করার মতো। যেমন—

(ক) ''ভারতবর্ষে ফিরলুম, কিন্তু এ কোন ভারতবর্ষ! যাকে রেখে গেছলুম সে নেই।''[৭২]

(খ) ''বম্বেতে যখন নামলুম তখনি ভারি মিষ্টি লাগল মারাঠা কুলিদের কর্মকালীন গোলযোগ।''[৭৩]

(গ) ''সত্যি কি কোন কালে ইউরোপে ছিলুম।''[৭৪]

(ঘ) ''Bandol নামক গ্রামে আমরা একটি দুপুর কাটালুম।''[৭৫]

ভ্রমণ কাহিনী রচনা করতে গিয়ে অন্নদাশঙ্কর বিচিত্র ধরনের উপমা ব্যবহার করেছেন। যেমন—

(ক) ''আমি ঘরে বসে লিখছি আমার চোখ জোড়া অশ্বমেধ ঘোড়ার মতো ভূপ্রদক্ষিণে এগিয়ে চলল।''[৭৬]

(খ) ''বড়দিনের ছুটিতে লেঁজায় গিয়ে দেখি সে এক তুষারময় স্বপ্ন যেন নিসর্গের তাজমহল।''[৭৭]

(গ) ''ভারতবর্ষের মাটির ওপর থেকে শেষবারের মতো পা তুলে নিলুম, আর সদ্যোজাত শিশুর মতো মায়ের সঙ্গে আমার যোগসূত্র এক মুহূর্তে ছিন্ন হয়ে গেল।''[৭৮]

(ঘ) ''সদ্যোজাত শিশুর মতো মায়ের সঙ্গে আমার যোগসূত্র এক মুহূর্তে ছিন্ন হয়ে গেল।''[৭৯]

(খ) ''মিষ্টান্নের দোকানে শিশুর মতো মানুষ কেবলি উতলা হয়ে ভাবে, কোনটা ছেড়ে কোনটা দেখি, কোনটা ছেড়ে কোনটা রেখে কোনটা নিই।''[৮০]

এবারের অন্নদাশঙ্কর রায়ের প্রবন্ধের বিষয় অনুযায়ী শৈলীও কীভাবে বদলে যাচ্ছে— তা দেখার মতো—

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধের শৈলীতে তিনি যেন বহুজ্ঞানী, পাকা শিল্পীর পরিচয় দিয়েছেন। যেমন— ''সংস্কৃতিকে শুদ্ধ করতে হবে: এ ভূত নামতে চায় না। যা হাজার বছর হলো মিশ্র, আজ তাকে অমিশ্র করার স্বপ্ন দেখা হচ্ছে। হাজার বছর? তার আগেও কি সে মিশ্র ছিল না? শক হুন কুশান ইত্যাদি কি বাইরে থেকে এসে গঙ্গাপ্রবাহে মধ্য এশিয়ার বারিধারা মেশায়নি? আরো আগে আর্য দ্রাবিড় মঙ্গোল কোল ইত্যাদি? বৈদিকের সঙ্গে বৌদ্ধ, ষড়দর্শনের সঙ্গে আরো ছয়টি দর্শন, আস্তিক্যের সঙ্গে নাস্তিক্য? সংস্কৃতির স্বভাবই এই যে, তার মধ্যে বহু স্বতোবিরোধ থাকে। যে সংস্কৃতি নানা বিবাদী সুরকে সংগতি দিতে জানে না সে তার শুদ্ধতা নিয়ে কালগর্ভে বিলীন হয়। আমাদের সংস্কৃতি যে এখনো বিলীন হয়নি তার কারণ বৈচিত্র্যকে অশুদ্ধ বলে বর্জন করা যৌবনকালে তার স্বভাব ছিল না। এ ভাব এসেছে বৃদ্ধবয়সে। জরাকে যৌবনে পরিণত না করলে সে আমাদের নবলব্ধ স্বাধীনতাকেও জরাগ্রস্ত করবে।''[৮১]

''আরও একটা কাথা। ইসলাম আর আরব, পারস্য, আফগানিস্থান ইত্যাদি দেশ এক জিনিস নয়। আরব দেশের লোক মুসলমান হবার পূর্বেই ভারতীয়দের সঙ্গে বাণিজ্য করত ও সেইসূত্রে সংস্কৃতি বিনিময় করত। অষ্টম শতাব্দীতে মুহম্মদ বিন কাসিম যখন সিন্ধুপ্রদেশ জয় করেন তখন সিন্ধু আর হিন্দের মাঝখান দিয়ে হাকরা বলে একটি নদী ছিল। হিন্দের রাজারা সিন্ধ নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। সিন্ধের আর বিজেতারাও হাকরা নদীর সীমান্ত অতিক্রম করতে চেষ্টা করেন নি। কয়েক শতাব্দী এইরূপ সহ-অবস্থানেই কেটে যায়। আরব বা ইরান থেকে আর-কেউ আক্রমণ করেন না। আক্রমণটা আফগানিস্থানের দিক থেকে। সেকালের আফগানিস্থান ছিল ভারতেরই অঙ্গ। অধিবাসীরা হিন্দু বা কাশ্মীরের অধিবাসীরা। নামও তখন আফগানিস্থান ছিল না। গান্ধার প্রভৃতি বিভিন্ন নাম ছিল বিভিন্ন অংশের। ধর্মান্তর গ্রহণ এক শতাব্দীর ব্যাপার ছিল না। ছিল বহু শতাব্দীর

ব্যাপার। এতকাল পরেও সে দেশে এখনো কিছু হিন্দু অবশিষ্ট আছে। তারা বাইরে থেকে যায়নি। সেখানকারই লোক। সেরকম এক হিন্দুর সঙ্গে আমার রেলপথে আলাপ। আফগান আক্রমণ ঠিক বিদেশী আক্রমণ ছিল না। ঠিক বিধর্মী আক্রমণও নয়। সুলতান মাহমুদের একজন হিন্দু সেনাপতি ছিলেন শুনেছি। রাজায় রাজায় যুদ্ধ। মন্দির ধ্বংসটা মণিমাণিক্য, সুবর্ণ, রজতের লোভে। মন্দিরে এসব সুরক্ষিত হত। মন্দিরের আয়ও ছিল রাজদরবারের মতো। ইউরোপে খ্রীস্টানরা ধ্বংস করেছে পেগানদের মন্দির, মুসলমানরা খ্রীস্টানদের গির্জা, প্রটেস্টান্টরা ক্যাথলিকদের মঠ বাড়ি। হিন্দু রাজারাও যে আর হিন্দু সম্প্রদায়ের মন্দির ধ্বংস করেন নি তা নয়। দক্ষিণ ভারতে দৃষ্টান্ত মেলে। ধর্মস্থানকে ধ্বংস করে ধর্মকে ধ্বংস করা যায় না। রুশ ও চীনা বিপ্লবীরাও এটা শিক্ষা করেছেন।"[৮২]

আবার শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধের শৈলীতে মিশে আছে অন্নদাশঙ্করের পাণ্ডিত্য, সুদূরপ্রসারী ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চিন্তা— ''যে সব ছাত্রছাত্রী স্কুলে পড়বার সময় বাংলা মাধ্যমে পড়েছে তারা কলেজে ভর্তি হয়ে ইংরেজী মাধ্যমে পড়তে বাধ্য হলে মহাবিপদে পড়ে। তাদের খাতিরে কলেজের শিক্ষার মাধ্যম বাংলা হওয়া উচিত, কিন্তু অন্যান্য ছাত্রছাত্রীরা যদি স্কুলের পড়া ইংরেজী মাধ্যমে করে থাকে ও কলেজেও সেই মাধ্যমে পড়তে চায় তবে একই যুক্তি অনুসারে তাদের খাতিরে ইংরেজী মাধ্যম বহাল রাখাও উচিত। নইলে তারাও মহাবিপদে পড়বে। ছাত্রছাত্রীদের কাউকেই বিপন্ন করা উচিত নয়।"[৮৩]

''স্কুলের শিক্ষার সংস্কার না করে কলেজের শিক্ষার সংস্কার যেন গোড়া কেটে আগায় জল। অনুপযুক্ত ছাত্রদের দিয়ে একটি কি দুটি বাদে প্রায় প্রত্যেকটি কলেজে ভরে গেছে। তারা গায়ের জোরে ডিগ্রী আদায় করতে পারে, কিন্তু ডিগ্রীলাভ আর শিক্ষালাভ তো একই জিনিস নয়। ডিগ্রীলাভ করে তারা যে চাকরিবাকরির যোগ্য হবে এটা তাদেরি মনের মরীচিকা। গায়ের জোরে হয়তো চাকরিও আদায় করবে ও তাতে টিকেও থাকবে, কিন্তু জনসাধারণকে তাদের প্রদত্ত করের বিনিময়ে সেবা দিতে পারবে না। জনসাধারণ মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রক্ত জল করে যে ট্যাক্স যোগাবে তা দিয়ে লক্ষ লক্ষ সাদা হাতী পোষা হবে। আজ আমরা ছাত্রবিদ্রোহ দেখছি, কাল আমরা গণবিদ্রোহ দেখব।"[৮৪]

অন্যদিকে ধর্ম বিষয়ক প্রবন্ধগুলিতে অন্নদাশঙ্করের ধর্মনিরপেক্ষ মনের পরিচয় পাওয়া যায়। সরল বাক্যের মধ্য দিয়ে সরল ভাবে ধর্মের মূল কথা বলার ধরন আমাদের ভাবায়—

''সর্বধর্ম সমন্বয় মস্ত বড়ো কথা। সে রকম কোনো আদর্শ আমি অঙ্গীকার করিনি। কিন্তু সব ধর্ম থেকেই সার সংগ্রহ করতে চেষ্টা করেছি। সেটাই আমার আদর্শ। এমন কোন ধর্ম নেই যাতে কিছু না কিছু অন্যধর্মের লোকের গ্রহণযোগ্য উপাদান নেই। তা বলে সব কিছুই অন্যর গ্রহণযোগ্য

নয়। তাই যদি হত তবে ধর্মে ধর্মে বিরোধ বাধত না। অথচ বেধেছে দীর্ঘকাল ধরে। এক খ্রীস্টধর্মেরই শাখায় শাখায় কী সংঘাত! উত্তর আয়ারল্যাণ্ড আজও তার সাক্ষী। একই ঈশ্বর, একই ত্রাণকর্তা, একই শাস্ত্র, তা সত্ত্বেও হিংসাপ্রতিহিংসা। কেউ যেন না মনে করেন যে হিন্দুরা এর উর্ধ্বে। বৌদ্ধ ও জৈনদের উপর একদা কম অত্যাচার হয়নি। ওরা যদি নিতান্ত মুষ্টিমেয় না হত তা হলে ওদের নিয়ে বিবাদ আজও বাধতে পারত। কারণ, ওরা ঈশ্বর মানে না, অবতার মানে না, অমরত্ব মানে না। ব্রাহ্মণকেও মানে না। যেখানে ও যখন ওদের সংখ্যার জোর ছিল সেখানে ও তখন ওরাও প্রতিরোধ করেছিল। ওদের সঙ্ঘশক্তি দুর্বল না হলে ওরা এমন দুর্বল হত না। নানা কারণে ওদের সঙ্ঘ ভেঙে যায় বা খণ্ড খণ্ড হয়ে যায়। তা ছাড়া রাজশক্তিও হাতছাড়া হয়।''[৮৫] অন্নদাশঙ্কর রায় সেকিউলারিজমকে ভারতের জন্য রাষ্ট্রীয় আদর্শ বলে নির্ধারণ করেন।

অন্যদিকে ভারত-চীন সীমান্ত নিয়েও পত্রাকারে বেশ কিছু প্রবন্ধ লিখেছেন। তার শৈলীতে মিলে ব্যক্তিগত আলাপনের ঢং কিন্তু রাজনৈতিক সুর বেশ জোরালো। ভাষায় রয়েছে গতি—

''আমি সংকল্প করেছি যে রাজনীতি নিয়ে লেখা আর নয়। এক জীবনের পক্ষে যথেষ্ট হয়েছে। এর ঊর্ধ্বে যদি না উঠতে পারি কোনো মহৎ কাজই আমার হাত দিয়ে হবে না। অবশ্য রাজনীতি বলতে এখানে বুঝতে হবে যা সাহিত্যের দিক থেকে বুনিয়াদী নয়। একপ্রকার রাজনীতি আছে যা না থাকলে সাহিত্য দাঁড়াতে পারে না। তার নাম চিন্তার স্বাধীনতা, বাক্যের স্বাধীনতা, বিশ্বাসের স্বাধীনতা, আপনার মতো করে বাঁচার স্বাধীনতা। যাকে বলে সিভিল লিবার্টি। তা যদি কোনো দিন বিপন্ন হয় সাহিত্যও বিপন্ন হবে। তেমন দুর্দিন যদি আসে তা হলে আমি উদাসীন থাকব না।''[৮৬]

অপরদিকে ব্যক্তিজীবন বিষয়ক প্রবন্ধগুলির অন্তরালে প্রাবন্ধিকের শিল্পী মানসের মন ফুটে উঠেছে। একটি উদাহরণ—

''নকলনবীশী করতে করতে ক্রমে ক্রমে বুঝতে পারি যে আমারও কিছু বলবার আছে ও সেকথা আমি আমার মতো করেই বলব। আর কারো মতো করে নয়। আত্মবিশ্বাস আসতে আরো সময় লাগে। তার আগে আমি আরো পড়াশুনা করি, আরো বড়ো বড়ো লেখকের মানসিক সংস্পর্শে আসি। টলস্টয়, দস্টোয়েভ্স্কি, বালজাক, রলাঁ, ইবসেন, বার্নাড শ ইত্যাদির সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে চলেন রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী। তেমনি ওড়িয়া সাহিত্যের রাধানাথ, মধুসূদন, ফকীরমোহন। ইংরেজী, বাংলা, ওড়িয়া তিনটে নৌকোতেই আমি পা রেখেছিলুম। সাধ ছিল আমেরিকায় গিয়ে ইংরেজী ভাষার সাংবাদিক হব। কিন্তু আমার নিয়তি আমাকে সাহিত্যের দিকেই টানছিল। আর আমেরিকার বদলে ইউরোপের দিকে। ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের প্রতিযোগিতায়

সফল হয়ে একদিন জাহাজে উঠে বসি ও লিখতে শুরু করে দিই 'পথে প্রবাসে'।"[৮৭]

অন্যদিকে মনীষীদের নিয়ে লেখা যে প্রবন্ধ, তার শৈলীর ধরন বিষয় অনুযায়ী। যেমন—

''রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব এইখানে যে, তিনি তাঁর অপরাপর কাব্যের মতো করে তাঁর জীবনকালকে ছন্দে মিলে উপমায় ব্যঞ্জনায় কল্পনার প্রসারে ও অনুভূতির গভীরতায় একখানি গীতিকাব্যের ঐক্য দিয়েছেন। সেটি বেশ একটি গোটা জিনিস হয়েছে, ভাঙা ভাঙা বা অসম্বন্ধ হয়নি, অন্তর্বিরোধ সম্পন্ন বা অসঙ্গতি বহুল হয়নি। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কীর্তি তাঁর জীবন। তাঁর অন্যান্য কীর্তি বিস্মৃত হয়ে যাবার পরও তাঁর এই কীর্তিটি জীবিত মানুষের আন্তরিকতম যে জিজ্ঞাসা— 'কেমন ভাবে বাঁচবে?'— সেই জিজ্ঞাসার একটি সত্য ও নিঃশব্দ উত্তর হয়ে চিরস্মরণীয় হবে।"[৮৮]

''টলস্টয় আমার অন্যতম গুরু। কি জীবনে কি শিল্পে। যেমন রবীন্দ্রনাথ। দু'জনে এঁরা এক বন্ধনীভুক্ত। কেউ কারো চেয়ে বড়ো বা ছোট নন। ষোল বছর বয়সে আমি টলস্টয়ের 'তেইশটি কাহিনী' পুরস্কার পাই। তার একটি বাংলায় অনুবাদ করে 'প্রবাসী'তে পাঠিয়ে দিই। সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশিত হয়। আর রবীন্দ্রনাথের 'চয়নিকা' পড়ি তাঁর নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির কিছুদিন পরে। যখন আমার বয়স দশ কি এগারো। 'ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে' বুঝতে কষ্ট হয়, মুগ্ধ হয়ে পড়ি 'একা কুম্ভ রক্ষা করে নকল বুঁদিগড়'। বারো বছর বয়সে 'সবুজ পত্র' হাতে পাই। 'ঘরে-বাইরে' বুঝতে পারিনে, 'সবুজের অভিযান' মুখস্থ করি। 'প্রবাসী'তে পড়া হয়ে যায় 'বলাকা' ও 'পলাতকা'র বহু কবিতা।"[৮৯]

সাহিত্য শিল্প নিয়ে যে প্রবন্ধগুলি লিখেছেন তার শৈলীতে মেলে চুম্বকত্ব— পাঠক প্রবন্ধ পড়া শুরু করলে শেষ করতে চাইবে না। মনে হয় আরো পড়ি। এতটাই আকর্ষণ তাঁর প্রবন্ধের। যেমন—

''সাহিত্য বলতে আমি বুঝি অন্তর্জীবনের বহিঃপ্রকাশ ও সেই সঙ্গে বহিঃর্জীবনের যতদূর সম্ভব প্রকাশ। ভিতরে যা আছে তাকে বাইরে এনে দেখানো। বাইরে যা আছে তাকে যতদূর সম্ভব ফোটানো। অন্তশ্চক্ষু ও বিহিশ্চক্ষু একই সঙ্গে খুলে রাখতে হয়। সাহিত্য কোন কালেই নৈর্ব্যক্তিক ছিল না। এখন যদি আমরা দাবি করি সে নৈর্ব্যক্তিক হোক তবে সে দাবি মানতে সাহিত্যিকরা সহজে রাজী হবেন না। তাঁদের জোর করে মানাতে হবে। ফলে সাহিত্য হবে যন্ত্রচালিত। পাঠের তাতে রুচি হবে না। শাস্ত্রচালিত সাহিত্য কি কেউ খুশি হয়ে পড়ে? মতবাদশাসিত সাহিত্যও তেমনি।"[৯০]

অপরদিকে তাঁর সাক্ষাৎকারগুলিতেও যে শৈলী বা ঢং-এ বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন, তা

মনে হয় তিনি যেন সত্যিই একজন পাকা বুদ্ধিজীবী। যুক্তির পর যুক্তি দিয়ে কীভাবে সিদ্ধান্তে পৌঁছান। তার একটি নমুনা—

ধীমান দাশগুপ্তের প্রশ্ন—

''রবীন্দ্রোত্তর যুগে আপনি বোধ হয় একমাত্র লেখক যিনি শুধু সাহিত্যের বিভিন্ন শাখাতে নন, ইতিহাস/রাজনীতি/সংস্কৃতি/বিজ্ঞান/অর্থনৈতিক পরিকল্পনা— বিচিত্র ও বিবিধ বিষয়ে আগ্রহী। গ্রীক দার্শনিকদের এনসাইক্লোপেডিক অন্বেষার কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায়। জগৎ সম্বন্ধে, জীবন ও মানুষ সম্বন্ধে, সমাজ সম্বন্ধে আপনার অফুরন্ত জিজ্ঞাসা ও কৌতূহল। গল্প ও উপন্যাসের মত সৃজনশীল রচনায় তার সচেতন ও সদর্থক ছাপ পড়ে। আপনি নিজেই বলেছেন, আবাল্য আপনি দুই মহান সাহিত্য প্রবাহে লালিত, একটি ভারতীয় সাহিত্যের তিন হাজার বছরের ধারা, অন্যটি য়ূরোপীয় রেনেশাঁসের পাঁচশো বছরের জোয়ার। আপনার সাহিত্য এই দুই ধারার অনবদ্য সমন্বয়, তাতে মনন, ইমোশন, বিউটি ও এপিক স্পিরিটের চমৎকার সংশ্লেষণ ঘটেছে। রাসেল জীবনভর তিনটি বর চেয়েছেন— উইসডম, প্রেম, প্রতিবাদের স্পৃহা। আপনি চেয়েছেন— ইলুমিনেশন, প্রেম, সৃষ্টির আনন্দ বেদনা। আপনার এই জীবনদর্শন ও সাহিত্যলোকের কথা আপনার বহু প্রবন্ধে বারবার বলেছেন। আজ বলুন তা আপনার সৃজনশীল সাহিত্যকে কীভাবে নিয়ন্ত্রিত ও বিকশিত করে?

অন্নদাশঙ্কর রায়ের উত্তর—

''নানা বিষয়ে আগ্রহ আমার ছেলেবেলা থেকে। ছেলেবেলা থেকে আমি সংবাদপত্রের মনোযোগী পাঠক। দেশ-বিদেশের খবরের সঙ্গে আমি সমসময় তাল রেখে চলতে চাই। সময়ের সঙ্গে তাল রেখে চলতে চাই। ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি— নানা বিষয়ের বই প্রথমে আমাকে পড়তে হয়েছিল সরকারী চাকরির প্রতিযোগিতায় নিজেকে প্রস্তুত করার জন্য, স্রোতের দীয়া পরে সেসব আমি পড়ি পাঠের বিচিত্র আনন্দের জন্য। সে অভ্যাস আজও আমার রয়েছে।

ভারতীয় ও ইউরোপীয়— আবাল্য দুটি ভাবধারাই ছিল আমার কাছে সত্য। প্রেরণার জন্য আমি কখনো ফিরে তাকাতুম অতীতের দিকে। সে অতীত স্বদেশের অতীত। আবার কখনো তাকাতুম পশ্চিমের দিকে। যে পশ্চিম স্বযুগের ভাবকেন্দ্র। পূর্ব ও পশ্চিম দিক্ সূচক শব্দ হলেও পূর্ব-পশ্চিম বলতে আসলে যা বোঝাত তা যুগসূচক। প্রাচী বললেই মনে আসে একটা প্রাচীন ভাব। আর প্রতীচী বললেই একটা আধুনিক ভাব। কিন্তু এই মিলন নামে পূর্বের সঙ্গে পশ্চিমের, কাজে ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার। কিন্তু এই মিলন বা বোঝাপড়া হবে কী করে? হবে কতখানি? রামমোহনের সময় থেকেই এ চিন্তা আমাদের চিন্তানায়কদের চিন্তিত করে এসেছে। ভারতের স্বাধীনতাও সে প্রশ্নের যথেষ্ট উত্তর নয়। আমরা ক্রমশ হৃদয়ঙ্গম করছি যে দেশকে স্বাধীন করাই যথেষ্ট নয়, দেশের মানুষকে

স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে, নির্মাণ করতে, সৃষ্টি করতে শেখাতে হবে। পশ্চিমের সঙ্গে আধুনিকের সঙ্গে পা মিলিয়ে নিতে হবে। পাশ্চাত্যের সঙ্গে, ঐতিহ্যের সঙ্গে অন্বয় রক্ষা করতে হবে জনগণের সঙ্গে, লোক-সংস্কৃতির সঙ্গে যোগসূত্র অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। সার্থক সংস্কৃতির এই তিনটে দিক।"[৯১]

উপরিউক্ত উদাহরণগুলির মধ্য দিয়েই আমরা বুঝতে পারি প্রাবন্ধিক অন্নদাশঙ্কর রায়ের প্রবন্ধগুলি শৈলীর বিচিত্র ঢং এ গড়া। বিষয় অনুযায়ী শৈলীতে এসেছে নতুন নতুন ফর্ম। কখনো পত্রের আকরে, কখনো সাক্ষাৎকারের ঢং এ প্রবন্ধ লিখেছেন। সাথে সাথে শৈলীতেও এসেছে নানা ভাঙা-গড়া বা পরীক্ষা-নিরীক্ষার নানা ধরন। অন্নদাশঙ্করের শৈলীর পেছনে রয়েছে বিশুদ্ধি। রয়েছে যুক্তিবাদ ও বৈজ্ঞানিকতা। তাঁর গদ্য সত্যিই বুদ্ধিজীবীদের গদ্য। মননশীল চিন্তার আধার যোগায় তাঁর প্রবন্ধ। তাঁর সাহিত্যে মিশে আছে রূপদক্ষ শিল্পীর শিল্পীয়ানা। শৈলীর কারণেই তার গদ্য— অখণ্ড শিল্প দর্শন রূপে গড়ে উঠেছে। তাঁর ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতাই যেন তাঁর রচনার শৈলীর প্রথম সোপান। মন ও বুদ্ধির সমস্ত মৌলিক শক্তির মেলবন্ধন ও ব্যবহার তাঁর প্রবন্ধে সচেতন ভাবেই ঘটিয়েছেন বলে তাঁর একএকটি প্রবন্ধ একএকটি চিন্তার খোরাক জোগায় অতি সহজেই।

তথ্যসূত্র:

১. রায় অন্নদাশঙ্কর - প্রবন্ধ সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, সম্পাদনা ধীমান দাশগুপ্ত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, প্রথম প্রকাশ, পৌষ ১৪০১, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৪১০, পৃ. ২৫

২. ঐ - পৃ. ২৫

৩. চক্রবর্তী সুমিতা - ভূমিকা, প্রথম চৌধুরী প্রবন্ধ সংগ্রহ, প্রজ্ঞাবিকাশ, প্রথম প্রকাশ ১৯৫২, সংস্করণ ২০১৩, পৃ. ১৩৯

৪. রায় অন্নদাশঙ্কর - প্রবন্ধ সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, সম্পাদনা ধীমান দাশগুপ্ত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, প্রথম প্রকাশ, পৌষ ১৪০১, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৪১০, পৃ. ২৬

৫. রায় অন্নদাশঙ্কর - প্রবন্ধ সমগ্র, পঞ্চম খণ্ড, সম্পাদনা ধীমান দাশগুপ্ত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, প্রথম প্রকাশ, অগ্রহায়ণ ১৪০৬, পৃ. ১০১

৬. রায় অন্নদাশঙ্কর - প্রবন্ধ সমগ্র, প্রথম খণ্ড, সম্পাদনা ধীমান দাশগুপ্ত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, প্রথম প্রকাশ, অগ্রহায়ণ

১৪০৬, পৃ. ৫২

৭. দাশগুপ্ত ধীমান - গদ্যগঠন, বাণীশিল্প, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৭, পৃ. ১১৩

৮. শ' ড. রামেশ্বর - সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা, পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ ১৩৯০, অখণ্ড সংস্করণ ৮ই অগ্রহায়ণ, ১৪০৩, পৃ. ৪৮

৯. ঐ, - পৃ. ৪৮

১০. রায় অপূর্বকুমার - শৈলীবিজ্ঞান, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৯, দে'জ সংস্করণ ২০০৬, পৃ. ১৬

১১. ঐ, - পৃ. ২৪

১২. ঐ, - পৃ. ৭

১৩. ঐ, - পৃ. ৭

১৪. ঐ, - পৃ. ১৫

১৫. রায় অন্নদাশঙ্কর - প্রবন্ধ সমগ্র, ষষ্ঠ খণ্ড, সম্পাদনা ধীমান দাশগুপ্ত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, প্রথম প্রকাশ, অগ্রহায়ণ ১৪০৬, পৃ. ১০৬

১৬. দাশগুপ্ত ধীমান - গদ্যগঠন, বাণীশিল্প, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৭, পৃ. ১১৩

১৭. ঐ, - পৃ. ১১২

১৮. চক্রবর্তী সুমিতা - ভূমিকা, প্রথম চৌধুরী প্রবন্ধ সংগ্রহ, প্রজ্ঞাবিকাশ, প্রথম প্রকাশ ১৯৫২, সংস্করণ ২০১৩, পৃ. ৩৬২

১৯. ঐ, - পৃ. ৯০

২০. রায় জীবেন্দ্র সিংহ - প্রমথ চৌধুরী, মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রা:লি:, পৃ. ১১৭

২১. রায় শিবনারায়ণ সম্পাদনা - বিবেকী শিল্পী অন্নদাশঙ্কর, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল, ১৯৮৫, প্রথম 'মিত্র ও ঘোষ' সংস্করণ, পৌষ ১৪০৪, পৃ. ৫৯

২২. রায় অন্নদাশঙ্কর - পথে প্রবাসে, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, প্রথম প্রকাশ, ১৩৮০, পৃ. ১৩

২৩. হালদার গোপাল - সংস্কৃতির রূপান্তর, প্রজ্ঞাবিকাশ, প্রথম প্রকাশ ১৩৪৮, সংস্করণ ১৪১৯, পৃ. ৬৬

২৪. রায় অন্নদাশঙ্কর - পথে প্রবাসে, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, প্রথম প্রকাশ, ১৩৮০, পৃ. ৪৭

২৫. দাশগুপ্ত ধীমান - গদ্যগঠন, বাণীশিল্প, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৭, পৃ. ১১৩

২৬. ঐ - পৃ. ১১৫

২৭. ঐ - পৃ. ১২৭

২৮. ঐ - পৃ. ১১৮

২৯. ঐ - পৃ. ১১৮

৩০. রায় অন্নদাশঙ্কর - প্রবন্ধ সমগ্র, নবম খণ্ড, সম্পাদনা ধীমান দাশগুপ্ত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, প্রথম প্রকাশ, মাঘ১৪১৩, পৃ. ৭১

৩১. দাশগুপ্ত ধীমান - গদ্যগঠন, বাণীশিল্প, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৭, পৃ. ১১৮

৩২. রায় অন্নদাশঙ্কর - পথে প্রবাসে, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, প্রথম প্রকাশ, ১৩৮০, পৃ. ১১৯

৩৩. রায় অন্নদাশঙ্কর - প্রবন্ধ সমগ্র, সপ্তম খণ্ড, সম্পাদনা ধীমান দাশগুপ্ত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন১৪০৯, পৃ. ১৫৮

৩৪. রায় অন্নদাশঙ্কর - পথে প্রবাসে, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, প্রথম প্রকাশ, ১৩৮০, পৃ. ১৯

৩৫. মুখোপাধ্যায় নিশীথ - অন্নদাশঙ্কর রায়ের পথে প্রবাসে, সাহিত্য সঙ্গী, প্রথম প্রকাশ, ২০০২, পৃ. ৫৫

৩৬. রায় অন্নদাশঙ্কর - পথে প্রবাসে, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, প্রথম প্রকাশ, ১৩৮০, পৃ.

৩৭. রায় অন্নদাশঙ্কর - শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৫,সংস্করণ ১৯৯৪,

পৃ. ১০৬

৩৮. চক্রবর্তী সুমিতা - ভূমিকা, প্রথম চৌধুরী প্রবন্ধ সংগ্রহ, প্রজ্ঞাবিকাশ, প্রথম প্রকাশ ১৯৫২, সংস্করণ ২০১৩, পৃ. ৪৬১

৩৯. রায় অন্নদাশঙ্কর - পথে প্রবাসে, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, প্রথম প্রকাশ, ১৩৮০, পৃ.৭০

৪০. চক্রবর্তী বিপ্লব - সংকলন ও সম্পাদক, শৈলী চিন্তাচর্চা, রত্নাবলী, প্রথম প্রকাশ আষাঢ় ১৪১০, জুলাই ২০০৩, পৃ. ৪৬১

৪১. রায় অন্নদাশঙ্কর - পথে প্রবাসে, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, প্রথম প্রকাশ, ১৩৮০, পৃ.১৬

৪২. ঐ - পৃ. ২৫

৪৩. ঐ - পৃ. ২৩

৪৪. ঐ - পৃ. ৮৪

৪৫. ঐ - পৃ. ৪৪

৪৬. ঐ - পৃ. ৩২

৪৭. ঐ - পৃ. ২৫

৪৮. ঐ - পৃ. ২৯

৪৯. ঐ - পৃ. ২৮

৫০. চক্রবর্তী বিপ্লব - সংকলন ও সম্পাদক, শৈলী চিন্তাচর্চা, রত্নাবলী, প্রথম প্রকাশ আষাঢ় ১৪১০, জুলাই ২০০৩, পৃ. ৪৬৩

৫১. রায় অন্নদাশঙ্কর - পথে প্রবাসে, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, প্রথম প্রকাশ, ১৩৮০, পৃ.৩৬

৫২. ঐ - পৃ. ৩২

৫৩. ঐ - পৃ. ২০

৫৪. চক্রবর্তী বিপ্লব - সংকলন ও সম্পাদক, শৈলী চিন্তাচর্চা, রত্নাবলী, প্রথম প্রকাশ আষাঢ় ১৪১০, জুলাই ২০০৩, পৃ. ৪৬২

৫৫. রায় অন্নদাশঙ্কর - পথে প্রবাসে, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, প্রথম প্রকাশ, ১৩৮০, পৃ. ২০

৫৬. ঐ - পৃ. ৩০

৫৭. ঐ - পৃ. ৩৩

৫৮. ঐ - পৃ. ৮৯

৫৯. ঐ - পৃ. ১০৩

৬০. ঐ - পৃ. ২৯

৬১.ঐ - পৃ. ২৯

৬২. ঐ - পৃ. ২৬

৬৩. চক্রবর্তী বিপ্লব - সংকলন ও সম্পাদক, শৈলী চিন্তাচর্চা, রত্নাবলী, প্রথম প্রকাশ আষাঢ় ১৪১০, জুলাই ২০০৩, পৃ. ৪৬০

৬৪. রায় অন্নদাশঙ্কর - পথে প্রবাসে, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, প্রথম প্রকাশ, ১৩৮০, পৃ. ১৩

৬৫. চক্রবর্তী বিপ্লব - সংকলন ও সম্পাদক, শৈলী চিন্তাচর্চা, রত্নাবলী, প্রথম প্রকাশ আষাঢ় ১৪১০, জুলাই ২০০৩, পৃ.

৬৬. রায় অন্নদাশঙ্কর - পথে প্রবাসে, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, প্রথম প্রকাশ, ১৩৮০, পৃ. ১৩

৬৭. ঐ - পৃ. ১৩

৬৮. ঐ - পৃ. ৬৮

৬৯. ঐ - পৃ. ৭৫

৭০. ঐ - পৃ. ৮৮

৭১. ঐ - পৃ. ১১৪

৭২. ঐ - পৃ. ১২৬

৭৩. ঐ - পৃ. ১২৬

৭৪. ঐ - পৃ. ১২৮

৭৫. ঐ - পৃ. ১৯

৭৬. ঐ - পৃ. ২৯

৭৭. ঐ - পৃ. ৩২

৭৮. ঐ - পৃ. ১৬

৭৯. ঐ - পৃ. ১৬

৮০. ঐ - পৃ. ২৮

৮১. রায় অন্নদাশঙ্কর - প্রবন্ধ সমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, সম্পাদনা ধীমান দাশগুপ্ত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, প্রথম প্রকাশ, পৌষ ১৪০০, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৪০৫, পৃ. ৩৬

৮২. রায় অন্নদাশঙ্কর - প্রবন্ধ সমগ্র, সপ্তম খণ্ড, সম্পাদনা ধীমান দাশগুপ্ত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন ১৪০৯, পৃ. ১০৮

৮৩. রায় অন্নদাশঙ্কর - প্রবন্ধ সমগ্র, পঞ্চম খণ্ড, সম্পাদনা ধীমান দাশগুপ্ত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, প্রথম প্রকাশ, পৌষ ১৪০৫, পৃ. ৩০২

৮৪. রায় অন্নদাশঙ্কর - প্রবন্ধ সমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, সম্পাদনা ধীমান দাশগুপ্ত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, প্রথম প্রকাশ, পৌষ ১৪০০, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৪০৫, পৃ. ১৩৯

৮৫. রায় অন্নদাশঙ্কর - প্রবন্ধ সমগ্র, সপ্তম খণ্ড, সম্পাদনা ধীমান দাশগুপ্ত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন ১৪০৯, পৃ. ১৪৭

৮৬. রায় অন্নদাশঙ্কর - প্রবন্ধ সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, সম্পাদনা ধীমান দাশগুপ্ত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, প্রথম প্রকাশ, পৌষ ১৪০১, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৪১০, পৃ. ২১৮

৮৭. রায় অন্নদাশঙ্কর - প্রবন্ধ সমগ্র, ষষ্ঠ খণ্ড, সম্পাদনা ধীমান দাশগুপ্ত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, প্রথম প্রকাশ, অগ্রহায়ণ ১৪০৬, পৃ. ৯১

৮৮. রায় অন্নদাশঙ্কর - শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৫,সংস্করণ ১৯৯৪, পৃ. ৯৭

৮৯. ঐ - পৃ. ৩০

৯০. রায় অন্নদাশঙ্কর - প্রবন্ধ সমগ্র, ষষ্ঠ খণ্ড, সম্পাদনা ধীমান দাশগুপ্ত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, প্রথম প্রকাশ, অগ্রহায়ণ ১৪০৬, পৃ. ৩৯৫

৯১. ঐ - পৃ. ৪৮৪-৪৮৫